আগামী দিনের জীবন বিধান

সাইয়েদ কুতুব

অনুবাদ

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

আগামী দিনের জীবন বিধান

মূল
সাইয়েদ কুতুব

অনুবাদ
এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সাইয়েদ কুতুব ছিলেন এই শতাব্দীর প্রথম কাতারের একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। মিসর ছিলো তাঁর জন্মভূমি এবং কর্মক্ষেত্র। 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' নামক ইসলামী সংগঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। ইসলামী আন্দোলনে নিরাপোষ ভূমিকা পালনের কারণে মিসর সরকার তাঁকে ১৯৬৬ সনে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

সাইয়েদ কুতুব ছিলেন বলিষ্ঠ কলমের অধিকারী। তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী অসংখ্য মানুষের চিন্তার বিভ্রান্তি দূর করেছে।

এই গ্রন্থটি তাঁর রচিত 'আল-মুসতাকবিলু লি হাযাদ্‌দীন'-এর ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। পূর্বে এটি 'অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম' নামে মুদ্রিত হয়েছিলো। গ্রন্থটির সর্বশেষ অধ্যায়ের শিরোনামের অনুকরণে এবার এটির নাম করা হলো 'আগামী দিনের জীবন বিধান।'

গ্রন্থটিতে সভ্যতার বিশ্লেষক এবং নতুন সভ্যতা নির্মাণ-প্রয়াসীদের জন্য রয়েছে চিন্তার মূল্যবান খোরাক। এটির বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করতে পারায় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

– অনুবাদক

সূচীপত্র

ইসলাম : একটি জীবন বিধান

ইসলাম একটি জীবনাদর্শ– মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্যে উপযোগী একটি বাস্তবধর্মী বিধান। ইসলামের একটি তাত্ত্বিক দিক আছে। তা বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাখ্যা দান করে এবং এর মাঝে মানুষের পজিশন নির্দেশ করে। নির্ধারণ করে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ইসলামের তাত্ত্বিক উৎস থেকে উৎসারিত হয় বিভিন্নমুখী ব্যবস্থা ও সংগঠন। এগুলো আবার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় হয় বিকশিত। নৈতিকতা, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক– এসব কিছু সম্বন্ধেই ইসলামের আছে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ। এই সার্বজনীন বৈশিষ্টের কারণে অচিরে মানব জীবনের সব দিক ও বিভাগ স্বীয় আওতাধীন করে ইসলাম পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার বিশ্বাস, ইসলামই হবে আগামী দিনের জীবন বিধান।

ইসলাম সর্বব্যাপক এবং এর ব্যবস্থাগুলো পরস্পর সংগতিপূর্ণ। মানুষের জীবন, প্রয়োজন এবং কর্ম-প্রবাহের কোন একটি দিক সম্বন্ধেও ইসলাম উদাসীন নয়। ইসলাম বাস্তব জীবন হতে বিচ্ছিন্ন শুধু আবেগ-প্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম নয়। এটা ন্যূনতম পূজা-অর্চনার বিধি ব্যবস্থার নামও নয় যা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সম্পন্ন করলে ঈমানের দাবী আদায় হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক মতবাদ মানুষের পার্থিব সমৃদ্ধি সাধন করতে গিয়ে ধর্মকে এড়িয়ে গেছে। সেই অভাবটুকু পূরণ করে শুধু পারলৌকিক জীবনে জান্নাত প্রাপ্তির পথ দেখাবার নামও ইসলাম নয়। ইসলামী ব্যবস্থার বিস্তৃতি এতো ব্যাপক যে বাস্তব জীবনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্কহীন একটা আবেগভিত্তিক বিশ্বাস হিসেবে একে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দৈনন্দিন জীবনে এর সুস্পষ্ট অনন্য অনুষ্ঠানগুলো, এর ন্যায়-শাস্ত্র এবং পদ্ধতি-বিদ্যা অনুসরণ না করে যারা কতিপয় ধর্মীয় আচার মেনে চলে তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী প্রত্যয়বাদ হিসেবেও ইসলামকে বিবেচনা করা যায় না। ধর্মীয় বনাম জাগতিক এই দু'ভাগে জীবনকে ভাগ করা ইসলাম কোনদিন স্বীকৃতি দেয়নি। অন্যান্য যেসব মতবাদ নিজেদেরকে "ধর্মীয়" বলে দাবী করে কেবল ওগুলোই জীবনের এই বিভাজনকে স্বীকৃতি দেয়, ইসলাম নয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামকে আবেগ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত

রাখার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই একটা প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে। জীবনের বিভিন্নমুখী কার্যাবলী থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং মানব জীবনের জাগতিক দিকের ওপর এর সামগ্রিক প্রতিপত্তি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। ইসলামের সর্বব্যাপকতা, বাস্তবমুখীনতা এবং প্রাধান্যের কারণে আন্তর্জাতিক খৃস্টবাদ সারা মুসলিম জাহানে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডার নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের এই বৈশিষ্টগুলো চক্রান্তকারী আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের হয়রানীর কারণ হিসেবে বহুকাল বিরাজ করেছিলো। শিগগিরই খৃস্টবাদ এবং ইহুদীবাদ একত্রিত হলো। তাদের লক্ষ্য : ইসলামের চূড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে প্রথমে একে একটা আবেগ-ভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটা ধর্মরূপে প্রমাণ করা। বাস্তব জীবনে ইসলামী ব্যবস্থার যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তাকে খর্ব করার ইচ্ছা নিয়েই এরা এই কাজ করে চলছে। বড়ো রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা সফলও হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টা সাফল্যের সর্বোচ্চ সীমা অর্জন করেছে কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে। কামাল আতাতুর্ক ইসলামী খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করলেন এবং তাঁর দেশকে পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন। বিদেশী শাসনাধীন থাকাকালে অপরাপর মুসলিম দেশগুলোতেও এই ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিলো ইসলামী শরীয়াতকে আইনের একমাত্র উৎস হবার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা, এর পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন-কানুনের প্রচলন করা এবং ইসলামী শরীয়াতকে 'ব্যক্তিগত আইন' নামে জীবনের এক সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ করা।

কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে চক্রান্তকারীদের প্রথম বিজয় অর্জিত হলো। এবার শুরু হলো পরবর্তী পদক্ষেপ- দ্বিতীয় লড়াই। সেই লড়াই চলছে আজকের সবগুলো মুসলিম দেশেই যেগুলো একদিন ছিলো 'ইসলামিক'। এমনকি শুধু ধর্ম হিসেবেও ইসলামকে উৎখাত করার চক্রান্ত চলছে। ইসলামের আসনে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ধ্যান-ধারণাকে বসাবার অশুভ প্রচেষ্টা তীব্রতর হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধেয়ে আসছে তার নিজস্ব মূল্যমান, অনুষ্ঠান এবং ব্যবস্থা নিয়ে। ঈমানের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট শূন্যতাকে কুফরী মতবাদ দিয়ে পূরণ করার অভিপ্রায়ে এই তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী পুনর্জাগরণের নেতা ও কর্মীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাদি গৃহীত হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অপরাপর বিবদমান শক্তিগুলো কোনকালে কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেনি। কিন্তু ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে আজ তারা সবাই হাত মিলিয়েছে। তাদের সবার মনে আতংক। আসন্ন ইসলামী পুনর্জাগরণ- স্বাভাবিক কারণেই যার আবির্ভাব

অবশ্যম্ভাবী এবং আভাস প্রায়শঃই পাওয়া যাচ্ছে– ইসলাম বিরোধী শিবিরে একটা দারুণ ভীতি সৃষ্টি করেছে।

ইসলাম এতো নিখুঁত, বিশাল ও মজবুত যে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত সব চেষ্টা চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই। আমরা নিশ্চিত যে শত্রুদের হিংসা যতো শক্তিশালী তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী মানব মুক্তির জন্যে ইসলামের প্রয়োজন। মানুষ আজ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাবধানবাণী শুনাচ্ছেন। তাঁরা মুক্তির পথ অন্বেষণ করছেন। কিন্তু আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা ছাড়া তো মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। সব স্থান থেকেই সাহায্য লাভ এবং উদ্ধার প্রাপ্তির ফরিয়াদ শ্রুত হচ্ছে। সবাই বিশেষ বৈশিষ্ট ও গুণের অধিকারী এক ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের প্রত্যাশা করছে। তার আগমন পথের দিকে তাকিয়ে অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে। কিন্তু তাদের বিশ্লেষিত গুণ ও বৈশিষ্ট ইসলাম ছাড়া অন্য কারো মাঝে বা কোন মতবাদে নেই। ইসলাম যেহেতু সুমহান বৈশিষ্টের অধিকারী এবং যেহেতু মানব জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণে সে সক্ষম, সেহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে ইসলামই হবে আগামী দিনের জীবন বিধান। একে অনন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এই ভূমিকা পালনের জন্যে এর ডাক পড়বে। কারণ, ইসলামের দুশমনেরা স্বীকার করুক আর না-ই করুক, এই ভূমিকা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই পালন করতে পারে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গোটা মানব জাতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইসলামকে ত্যাগ করে বাঁচতে পারবে না। মানুষ এখানে সেখানে স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ করতে পারে। কিন্তু এই আচরণের নিশ্চিত ফল বা করুণ পরিণতি তো আমাদের জানা হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অনুসরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষে এক অনতিক্রম্য গোলকধাঁধার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে। মানুষের ধ্যান-ধারণা, সাধনা ও অভিজ্ঞতা আজ অজ্ঞতা, অপূর্ণতা ও লালসার পংকে নিমজ্জিত। এই গোলকধাঁধাকে নতুন ও নির্ভুল ভিত্তির উপর পরিচালিত পরীক্ষণের মাধ্যমে ভেংগে ফেলতে হবে। মানুষের নিষ্কৃতি-মুক্তি এরি মাঝে নিহিত। নতুন ও নির্ভুল ভিত্তিটি তো হবে অবতীর্ণ বিধান। আর এই বিধান উৎসারিত নির্ভুল জ্ঞান থেকে, অজ্ঞতা থেকে নয়; পূর্ণত্ব থেকে, অপূর্ণত্ব থেকে নয়; শক্তি থেকে, দুর্বলতা থেকে নয় এবং বিচক্ষণতা থেকে, খেয়ালী মন থেকে নয়। এই ভিত্তি মজবুত করতে হবে মানবপূজা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ভেতর দিয়ে।

ইসলাম এবং অন্যান্য মতবাদগুলোর প্রকৃতিতে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী মানুষ এক মহান, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইবাদাত

করে থাকে। মানুষ তার ধ্যান-ধারণা, মূল্যমান, আচার অনুষ্ঠান, আইন-কানুন, নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্র কেবল তার কাছ থেকেই গ্রহণ করে। অন্যান্য মতবাদের অনুসারীরা প্রকৃতপক্ষে অনেক 'খোদার' এবং প্রতিমার পূজা করে থাকে। এই পূজার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ছাড়া অপর মানুষের প্রতি অভিভাবকত্ব-ক্ষমতা আরোপ করে।

তার মতো মানুষকেই সে খোদা বানিয়ে নেয়। সে তখন এই মানুষগুলোর কাছ থেকেই গ্রহণ করে মূল্যমান, অনুষ্ঠানাদি, আইন-কানুন এবং নৈতিক নীতিমালা। এই মতবাদগুলোকে আমরা জাহিলী মতবাদ বলি। এগুলোর রূপ যাই হোক না কেন, এগুলো যে দেশের বা যে কালের হোক না কেন, আমরা এগুলোকে অনৈসলামিক বলেই জানি। এই মতবাদগুলোর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের কারণ হচ্ছে এগুলো সেই ভুল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠা যে ভুল ভিত্তি হতে মানবতাকে মুক্ত করার জন্যে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম একত্ববাদের প্রশ্নে আপোষহীন। সে এসেছে অপরাপর মতবাদের মূলোৎপাটন করতে। কেননা ওসব মতবাদ মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করে। ইসলাম সব রকমের অধীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাকে কেবল আল্লাহর অধীন করতে এসেছে। আল্লাহ অদ্বিতীয়। তিনি বিশ্বজাহান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কিছু তালাশ করে? অথচ আসমান ও পৃথিবীর সবকিছু স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছে। তাঁর দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।" (আলে ইমরান)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটা সাময়িক ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের জন্যে তা অবতীর্ণ হয়নি। কোন একটা সংকীর্ণ পরিসরের জন্যেও তা প্রেরিত হয়নি। কোন বিশেষ পরিবেশ বা জেনারেশনের জন্যেও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে গতিশীল মানব জীবনের জন্যে একটা মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনি এক বৈশিষ্ট দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই সত্যপথের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে। নির্ভেজালভাবে আল্লাহর ইবাদাত করেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে।

অনাগত মানব গোষ্ঠীর জন্যে ইসলাম বিশ্বজনীন সদাসত্য বিধান হিসেবে বিদ্যমান। বিশ্ব-জোড়া কার্যকর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক পথে চলতে গেলে মানুষকে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ হয় পুরোপুরি ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ করে মুসলিম হবে, নয় তো মানব রচিত কোন মতবাদ গ্রহণ করে নাস্তিকতাবাদের জাহিলিয়াতে হাবুডুবু খাবে। ইসলাম অবিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হানতে এসেছে। এসেছে নাস্তি

কতাবাদ খতম করতে। এসেছে দুর্বিনীত নাস্তিকতাকে তার ভিত্তিস্তম্ভ হতে নীচে ফেলে দিতে। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামী মুক্ত করতে এসেছে এবং এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পী রূপে গড়ে তুলতে চাচ্ছে।

বিশ্ব মানবতাকে আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে কি অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণভাবে মেনে চলে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিশীল জীবনযাত্রা করবে, না মানব রচিত কোন মতবাদ অনুসরণ করবে। মানুষ যদি দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয় তাহলে প্রাকৃতিক আইন ও মানব প্রকৃতির সাথে বাধবে তার সংঘাত। কারণ মানব প্রকৃতিও তো আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতির একটা অংগ। এই সংঘাতের পরিণতি যা হবার তা অনিবার্যভাবেই সংঘটিত হবে।

আমাদের বিশ্বাস মানুষ আল্লাহর দিকেই ফিরে আসবে। ফিরে আসবে তাঁর হিদায়াতের দিকে। মানব সভ্যতার আসন্ন ভবিষ্যৎ ইসলামের জন্যেই নির্ধারিত বলে মনে হচ্ছে। আমাদের আস্থা আছে যে গতিশীল মানব জীবনের উপযোগী ইসলামী ব্যবস্থাকে বিকৃত করার সব হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ, ইসলামের প্রকৃতিই এমন যে জীবন থেকে পৃথক করে ফেলার মতো এটি নয়। জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান কোন অবতীর্ণ ধর্মেরই প্রকৃতি নয়।

ধর্মগুলো জীবন বিধান

মতবাদ এবং সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মতবাদ থেকে সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন তো রীতিমতো বিস্ময়কর। সমাজ ব্যবস্থা তার বৈশিষ্টসহ আসলে তো আদর্শিক মতবাদের শাখা বিশেষ। সমাজ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে। এই বর্ধন ও বিকাশ অতি স্বাভাবিক। জীবনের বাস্তব ঘটনাবলী এবং মানব জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত না করে কোন সমাজ ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগতভাবে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানব জীবনের পূর্ণত্ব ও স্থিতিশীলতার প্রতি নজর রেখেই একটা সমাজ ব্যবস্থাকে সম্মুখে এগুতে হয়। এই পৃথিবীতে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণাই তার নিজস্ব কর্ম, কর্মপদ্ধতি, সামাজিক সম্পর্ক, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির রূপ নির্ধারণ করে।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক ও স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রাণবন্ততার অভাব ঘটে। বিকাশের অল্প পরেই তার বিনাশ ঘটে। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার মিল, মানব প্রকৃতি ও তার প্রকৃত চাহিদার সংগতি একটা অস্বাভাবিক সমাজ-ব্যবস্থায় কখনো থাকতে পারে না। এই মিলের অভাব ঘটলেই মানুষ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। তার সার্বিক বস্তুগত সমৃদ্ধিও সেই সময় তাকে এই যাতনা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারমূলক সমাজ যখন স্বাভাবিকতা ও মানুষের স্বাভাবিক আচরণের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন সে তার মৃত্যু ঘণ্টাই বাজাতে থাকে। ওই সমাজকে পরিণামে নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হতে হয়।

স্বাভাবিক বর্ধন ও ক্রমবিকাশের জন্যে আদর্শিক মতবাদ ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে একটা সম্পর্ক। এই স্বাভাবিক পরিণতির আবির্ভাবের জন্যে সমাজ-ব্যবস্থা হতে হবে এমন যার মাঝে মানুষ জীবনের সার্বিক দিকের বিধান পাবে, যা মানুষের আবেগ, নৈতিকতা, ইবাদাত পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং প্রতিটি জাগতিক কর্মের দিক নির্দেশ করবে। এখানে আমরা দাবী করতে পারি যে প্রতিটি জীবন-ব্যবস্থাই ধর্ম। কেননা প্রতিটি ধর্মইতো সমাজে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে সক্রিয় থেকে সমাজের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে থাকে। যদি সমাজ ব্যবস্থা অবতীর্ণ মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, তবে সেই সমাজ অবতীর্ণ ধর্মের

অনুসারী সমাজ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সমাজ ব্যবস্থাটা কোন শাসক, গোত্র বা সম্প্রদায়ের চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তবে বলতে হবে যে সেই সমাজ 'শাসকের ধর্ম' বা 'গোত্রের ধর্ম' অথবা 'সম্প্রদায়ের ধর্ম' অনুসরণ করছে।

এই কালের দর্শন ও মতবাদের প্রবক্তারা এখন আর এই কথা বলতে দ্বিধা করছেন না যে তাঁরা মানুষের জীবনধারাকে সামগ্রিকভাবে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকেই মতবাদগুলো তৈরী করেছেন। এই দিক দিয়ে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় মতবাদগুলোকে অবতীর্ণ ধর্মগুলোর বিকল্প হিসেবে পরিবেশন করছেন।

কমিউনিজম কেবলমাত্র একটা সমাজ-ব্যবস্থা নয়। এটা একটা আদর্শিক মতবাদ। একটা জীবন বিধান। এর ভিত্তি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। বস্তুসত্তার অস্তিত্ব ও তার মধ্যকার বৈপরীত্যগুলো– যেগুলো ক্রমবিকাশের কারণ– হলো এই মতবাদের উপাদান। এই মতবাদ ইতিহাসের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দান করে। এই মতবাদ বলে মানব জীবনের সর্ব বিবর্তন-পরিবর্তন উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই কমিউনিজম শুধু একটা সমাজ-ব্যবস্থা নয়, এটা একটা ধর্মীয় বিশ্বাস যার উপরে গড়ে উঠে তার সমাজ-কাঠামো। অবশ্য এই মতবাদের সূচনা এবং তার সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। রয়েছে অসংগতি।

এমনিভাবে বিশ্লেষণ করা যায় অন্যসব সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা। এসবের রচয়িতাগণ এগুলোকে প্রত্যয়-বিশ্বাস বলেই আখ্যায়িত করেন। এগুলোকে তাঁরা সামাজিক বিশ্বাস অথবা জাতীয় বিশ্বাস ইত্যাদি বলে প্রচার করেন। এই নামকরণ থেকে এগুলোর ধর্মীয় রূপটা বেরিয়ে আসে। প্রকৃত পক্ষে, প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থা বা জীবন ব্যবস্থাই একটা ধর্ম। এই ব্যবস্থা যারা মেনে চলে সেটা তাদের ধর্মে পরিণত হয় এবং তা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তারা যদি অবতীর্ণ ধর্ম অনুসরণ করে, তবে তারা আল্লাহর ধর্ম অনুসরণ করে থাকে। তারা যদি অন্য কোন মতবাদ অনুসরণ করে, তবে তারা অন্য কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির ধর্ম অনুসরণ করে থাকে।

এটা বলাবাহুল্য যে এমন কোন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ কোনদিন আসেনি যা কেবলমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিকতায় সীমিত ছিলো এবং যা মানুষের বহুমুখী বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত ছিলো না। শুধু ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের জন্যেও কোন অবতীর্ণ বিধান আসেনি। মানব রচিত মতবাদগুলোর জন্যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব রিজার্ভ রেখে কেবল

"ব্যক্তিগত ব্যাপার" সাজার জন্যে কোন ধর্মের অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিলো না। 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে এমন একটি মানুষও এটা কল্পনা করতে পারে না যে অবতীর্ণ ধর্ম কেবল মানুষের আবেগ, অথবা ধর্মীয় আচরণ অথবা 'ব্যক্তিগত আইনের' ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের জন্যে এসেছে, মানুষের বাস্তব জীবন তথা সামগ্রিক জাগতিক জীবনে তার কোন বক্তব্য নেই। মানব রচিত 'ধর্ম'গুলোর জন্যে জাগতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণভার রেখে দিয়ে কেবল পারলৌকিক জীবন চর্চার জন্যে একটি ধর্মও অবতীর্ণ হয়নি। এই ধরনের ধারণা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিদ্রূপেরই শামিল। জীবনকে এভাবে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় : 'আল হাকীম' কেবলমাত্র জীবনের একটি দিকের তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম, এই দিকটার জন্যেই নির্দেশনামা জারী করতে পারেন এবং জীবনের অপর দিকটার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্যে তিনি অন্য খোদার মুখাপেক্ষী। এটা অতি হাস্যকর ব্যাপার। এই কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন একটু সচেতন হলেই তাঁরা নিজেদের চিন্তার অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করে নিজেদের প্রতিই বিদ্রূপের হাসি হাসবেন।

o o o o

মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকৃতিগত ও গঠনমূলকভাবে এককেন্দ্রিক এবং এককরূপে ক্রিয়াশীল। এক মূল ধারণা-প্রসূত এক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত না হলে মানব ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য ও সংগতি রক্ষা করে অগ্রসর হতে পারে না। যখন মানুষের বিবেক ও অনুভূতি কোন এক বিধান দ্বারা শাসিত হয় এবং তার বাস্তব জীবন আরেক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন মানুষের ব্যক্তিত্ব নেতিবাচক আচরণ-প্রচণ্ডতা ব্যাধিগ্রস্ত হতে বাধ্য। যখন তার বিবেক ও অনুভূতি শাসিত হয় মানব রচিত মতবাদ দ্বারা এবং তার বাস্তব জীবন শাসিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম দ্বারা, তখন তো এই ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি অনুভূতি ও বস্তুগত বাস্তবতার দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হয়। উদ্বেগ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা তাকে ঘিরে ফেলে। এই মানসিক ব্যাধি আজ ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হচ্ছে আমেরিকা ও ইউরোপের সমৃদ্ধ দেশগুলোতে। ক্ষয়িষ্ণু ধর্মীয় অনুভূতি মণ্ডিত বিবেক ও বিবেক-বিচ্যুত অন্যান্য মূল্যমানের সংঘাতের পরিণতি এটি। খৃস্টবাদের ইতিহাসের বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও জাগতিক জীবনের বিচ্ছেদের পরিণতি হিসাবে এই সংঘাত উদ্ভূত।

আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম গোটা বিশ্বজগত এবং এর সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাদান করে। এই ধর্ম মানবিক সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে পথের দিশা দেয়। মানুষের স্বাভাবিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে। এই ধর্ম তাকে মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে পারে। পারে পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সুখী হতে। এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে একটা মজবুত ও সুসংহত ব্যবস্থার অনুসৃতির মাধ্যমে যে ব্যবস্থা মানুষকে মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলে না এবং বিপর্যস্ত-ব্যক্তিত্ব ব্যাধি হতে তাকে রক্ষা করে। এভাবেই মানুষ বিশ্ব প্রকৃতি ও স্বীয় প্রকৃতির সংঘর্ষ এড়াতে পারে। মহা দুর্ভোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

প্রতিটি অবতীর্ণ ধর্ম এমনভাবে বিন্যস্ত যাতে তা মানুষের সুসমঞ্জস প্রত্যয়-বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে। আর যাতে এই ভিত্তির উপর গড়ে উঠতে পারে তাদের জীবন ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ইমারত। মূলতঃ ধর্মের মিশন হচ্ছে স্বর্গীয় বাস্তবতার সাথে মানুষের একটা কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের জীবন প্রবাহ ও আল্লাহর অনন্য ব্যবস্থার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা যাতে মানুষের প্রত্যয় ও কর্ম, তার জীবনের লক্ষ্য ও বিশ্ব জগতের লক্ষ্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় একটা নিবিড় ঐক্য– মজবুত সংহতি। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি ধর্মই মানুষের কর্মধারার প্রতিটি দিকে প্রসারিত হবার জন্যে নির্দেশিত। মানুষের মনের কোণে আবেগ-অনুভূতির মাঝে নিশ্চল হয়ে থাকার জন্যে এগুলো অবতীর্ণ হয়নি। অবতীর্ণ ধর্মের এটাও লক্ষ্য নয় যে মানুষকে কতগুলো নৈতিক পাঠ শেখানোর শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবে। মসজিদে বা গীর্জায় পালনীয় কতগুলো প্রাথমিক আচার মানুষকে জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেও ধর্ম অবতীর্ণ হয়নি। মানব জীবনে "ব্যক্তিগত ব্যাপার" সেজে অবস্থান করার জন্যেও ধর্ম অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ বলেন, "আমি এই জন্যে বার্তাবহ পাঠিয়েছি যাতে আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হয়।"

'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ কতগুলো প্রত্যয়-ধারা ও আইন বর্ণিত হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই আইনগুলো বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ইহুদীদেরকে। তাওরাতকে আবেগাপ্লুত ভাষণ ও প্রচারণার ভিত্তি বানাবার জন্যে অবতীর্ণ করা হয়নি। উপাসনালয়ে কয়েকটা ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করার ভিত্তি রূপেও তা অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ বলেন, "আমি মূসার প্রতি আইন প্রেরণ করেছিলাম। এতে ছিলো পথের দিশা ও আলো। ইহুদীদেরকে এই মানদণ্ডে

নিরীক্ষণ করা হয়েছে। তাদেরকে পরখ করা হয়েছে আল্লাহর অনুগত নবী, ধর্মবেত্তা ও আইন বেত্তাদের দিয়ে। তাদের উপর আল্লাহ্র কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিলো, এই ব্যাপারে তারা সাক্ষী। কাজেই মানুষকে ভয় করো না, ভয় কর আমাকে। আমার নির্দেশগুলোকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার আলোকে যারা বিচার নিষ্পত্তি করে না তারা অবিশ্বাসী।"

মূসার (আ) প্রতি প্রদত্ত আইন সম্পর্কে আল কুরআনের এই বক্তব্য তাওরাতে বিবৃত আইনসমূহের একটা উদাহরণ মাত্র। মূসা আলাইহিস সালাম এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহের আগত নবীগণ এসব আইন হিব্রু জাতির সামগ্রিক জীবনে কার্যকর করেছেন।

এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম এলেন। ইহুদীদের প্রতি নবী হিসেবে তিনি প্রেরিত হলেন। তিনি মূসার (আ) আইনগুলোকে আরো তাকিদ দিয়ে প্রচার করলেন এবং এগুলোর গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। ইহুদীদের ওপর আরোপিত কতিপয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাঁর সময়ে মওকুফ করা হলো। তিনি তাদেরকে সীমালংঘনের কারণে নির্ধারিত কতিপয় প্রায়শ্চিত্তকরণ ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। এই সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হচ্ছে, "ইহুদীদের জন্যে নখযুক্ত সব পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থি সংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিলো না। তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এই প্রতিদান দিয়েছিলাম। আমি তো সত্যবাদী।" (আল-আনয়াম)

এভাবে ইহুদীদের জন্যে প্রদত্ত আইন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ অনুমোদিত হলো। এগুলো ছিলো বিচার বিভাগীয় বিধান। আল্লাহ বলেন, "আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করলাম। ঈসা পূর্বতন আইনগুলোকে নিশ্চিত করলো। আমি তাকে বাণী পাঠালাম। এতে ছিলো পথের দিশা এবং আলো। আর আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে ছিলো সাবধানী বাণী।" (আল মায়িদা)

এরপর ইসলাম নিয়ে এলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। পূর্ববর্তীদের বিধানগুলোকে প্রত্যাহার করার জন্য তিনি আসেননি। তিনি সেগুলোকে অনুমোদিত করলেন এবং এগুলোতে ব্যাপকতা আনলেন। কারণ ইসলামই সর্বশেষ এবং সর্বব্যাপক বাণী যা আল্লাহ মানব জাতির জন্যে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম এসেছে মানব জাতিকে সত্য পথের দিশা দিতে। এই বিধান জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করলো। এমন এক ব্যবস্থা বিবৃত করলো যা মানুষকে জাহিলিয়াত ও অধার্মিকতা থেকে স্বর্গীয় বাস্তবতার নিকটবর্তী করে, তার জাগতিক কাজকর্মকে আল্লাহর

আইনের পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে এবং তার বিবেককে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণের সাথে সংযুক্ত করে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করার জন্যে তিনি তা করেননি। সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ওরা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুৎ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে তাদের কোন কোন পাপের জন্যে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা প্রাক ইসলাম যুগের বিচার-ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?" (আল মায়িদা)

এসব প্রধান প্রধান ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রতিটি অবতীর্ণ ইবাদাত-পদ্ধতি একত্ববাদ এবং এককেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থা মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এসেছিলো। নৈতিক আইনের শাখা-প্রশাখায় সেগুলো একটু-আধটু পৃথক ছিলো। কিন্তু মৌলিক ধারণার দিক থেকে অভিন্ন ছিলো। অভিন্ন ছিলো জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ণয়ের ব্যাপারে। প্রতিটি বিধান এক আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন শক্তির ইবাদাতকে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো।

অন্যান্য সব অবতীর্ণ বিধানের সারসংক্ষেপ আল কুরআনে বিবৃত হয়েছে। পূর্বেকার বিধানগুলোও ইসলামী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য– যা মানুষকে মানুষের ও বিশ্বের স্রষ্টার দিকে পরিচালিত করে– বিশ্লেষণ করেছে। আল কুরআন সর্বশেষ ও সবচেয়ে নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মানব রচিত মতবাদগুলোর সাথে ইসলামের পার্থক্যটা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন– এর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। বল, ইনিই আল্লাহ্– আমার প্রতিপালক, আমি নির্ভর করি তাঁর ওপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জী তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। আমি তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করেছি দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে– যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে– যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার দিকে আহ্বান করছো তা ওদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। ওদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেতো। ওদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। সুতরাং তুমি আহ্বান কর এই দীনের দিকে এবং তোমাকে যেভাবে এতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে সেভাবে থাক। ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বল : আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।" (আশ শূ'রা)

আল-কুরআনে শুয়াইব আলাইহিস সালাম এবং মাদিয়ান জাতি সম্পর্কিত আলোচনায় বাস্তব জীবনে আল্লাহর আইন অনুসরণের নির্দেশ এবং জাহিলিয়াত কবলিত মাদিয়ান জাতির আপত্তির কথা বর্ণিত আছে। এটা ছিলো সীমাহীন অজ্ঞতা। আজকের মানুষের অজ্ঞতার সাথে তার তুলনা চলে। আর সেই অজ্ঞতা ছিলো ধর্মের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে। ধর্মের দাবী ছিলো জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার, এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার। বিবেককে সাময়িকভাবে প্রদমিত করা অথবা উপাসনালয়ে প্রাণহীন আচার প্রদর্শন নয়।

"মাদিয়ানবাসীর কাছে তাদের এক ভাই শুয়াইবকে প্রেরণ করা হলো। সে তার জাতিকে ডেকে বললো : ওহে আমার কওম, আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। মাপ ও ওজনে কম করো না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ দেখছি, কিন্তু আমি একদিন তোমাদের প্রতি মহাশাস্তির ভয় পাচ্ছি। ওহে আমার কওম, মাপ ও ওজনে ন্যায়পরায়ণ হও। মানুষের যা প্রাপ্য তা তাদেরকে দিতে অস্বীকার করো না। দুষ্টুমী-মনোভাব-প্রসূত পাপাচার সংঘটিত করো না। আল্লাহ যা তোমাদের জন্যে রেখেছেন তা তোমাদের জন্যে উত্তম অবশ্য যদি তোমরা তা বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের প্রহরী নই। তারা বললো : ওহে শুয়াইব, তোমার ধর্ম কি বলে যে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যেসব উপাসনা করতে দেখেছি তা পরিত্যাগ করি? অথবা আমরা আমাদের সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তা করা থেকে বিরত থাকি? নিশ্চয়ই তুমি ত্রুটিমুক্তদের একজন এবং ন্যায়-পরায়ণ।"

এই সত্যতা সালিহ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর জাতির প্রতি আনীত বাণী সম্বন্ধে বর্ণনায় পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে। "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। ওসব সীমালংঘনকারীদের নির্দেশ অনুসরণ করো না যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং নিজেদের জীবনযাত্রাকে সংশোধিত করে না।" (আশ শুয়ারা)

এখানে সালিহ আলাইহিস সালাম তাঁর কাওমকে আল্লাহর ধর্মের দিকে ফিরে আসার তাকিদ দিচ্ছেন এবং আল্লাহর প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি মেনে চলতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সীমালংঘন ও যুলুম ভিত্তিক ইবাদাত পদ্ধতি পরিহার করতে বলছেন। মানুষের দাসত্ব-শৃংখল মুক্ত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

অন্যত্র আল্লাহ নবী জীবনের মিশন এবং অবতীর্ণ গ্রন্থের মিশন সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা মানুষকে মানুষ হতে এবং আল্লাহ হতে দূরে নিক্ষেপকারী বিষয়সমূহের ফায়সালার ব্যাপারে নবী ও কিতাবের ভূমিকা প্রসংগে দেয়া হয়েছে। "মানব জাতি ছিলো এক জাতি। আল্লাহ বার্তাবহ পাঠিয়েছেন সুসংবাদ ও সতর্কবাণীসহ। তাদের সাথে তিনি প্রেরণ করেছেন নির্ভুল কিতাব যাতে যেসব বিষয়ে মানুষের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে সেসবের মীমাংসা হয়ে যেতে পারে।" (আল বাকারাহ)

এখানে নবী জীবনের মিশন ও অবতীর্ণ কিতাবের ভূমিকা সম্বন্ধে যাবতীয় বির্তকের অবসান হলো। এই বাণী এই সত্যতাও প্রকাশ করলো যে আল্লাহর ধর্ম এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা আসলে একই জিনিসের দু'টো নাম।

০ ০ ০ ০

বাস্তব জীবনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আর বেশি আলোচনা এখানে প্রয়োজন নেই। কেননা ধর্ম যদি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং ধ্যান-ধারণা, আইন ও নির্দেশাবলী দ্বারা আমাদেরকে চলার পথে পরিচালিত না করে তাহলে মানব জীবনের মহা প্রয়োজনে এর তো কোন ভূমিকাই থাকে না। মানব জীবনের মৌলিক বিধান অবশ্যই একটা যুক্তিযুক্ত ধর্ম বিশ্বাসের উপরে নির্ভরশীল। যে ধর্ম বিশ্বাস বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যাখ্যাদান করে, এর সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং এই বিশ্বজাহানে মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পজিশন বিশ্লেষণ করে। আদর্শিক মতবাদ অবশ্যই আল্লাহর সাথে, বিশ্ব-জগতের সাথে অথবা অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

সর্বব্যাপক বিশ্লেষণের প্রজ্ঞা যদি আল্লাহর কাছ থেকে না আসে, স্বর্গীয় মূল্যবোধের ওপর যদি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে তো মানুষ মানবিক খেয়ালীপনা ও ভ্রান্ত ধারণার শিকারে পরিণত হতে বাধ্য। অবতীর্ণ ধর্মই এই দুর্ভাগ্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। এই ধর্মই আমাদের সচেতনতাকে উন্নততর স্বর্গীয় প্রজ্ঞায় পরিণত করে। বস্তুতঃ মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে বাধ্য হয়েই অপর মানুষের আনুগত্য করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর ধর্ম এসেছে মানুষকে অপর মানুষের অনভিপ্রেত দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্তি দিতে।

এই ব্যাপারে কোন বিতর্কই সৃষ্টি হতো না যদি ইউরোপে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব না হতো, যে পরিস্থিতি রাষ্ট্র ও জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করে ফেলেছে। সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিটা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। অবশ্য সেই পরিস্থিতির ভয়াবহ পরিণতি থেকে আল্লাহ তাঁর সত্যধর্ম ও ইতিহাসের প্রবাহকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সেই মারাত্মক পরিণতির প্রভাব আজো মানুষের মন-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নেতিবাচক আচরণের প্রচণ্ডতা

এটা স্বাভাবিক নয় যে এই পৃথিবীতে ধর্ম জীবন থেকে আলাদা হয়ে অবস্থান করবে অথবা কেবল বিবেক-অনুভূতি, নৈতিক নীতিমালা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত থাকবে। এটাও স্বাভাবিক নয় যে ধর্ম জীবনের এক সংকীর্ণ পরিসরে প্রযুক্ত হবে এবং 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে আখ্যায়িত হবে।

অবতীর্ণ ধর্ম জীবনের কোন একটা মাত্র দিককে আলাদা করে নিয়ে তা আল্লাহর অধীনে আনে না এবং কোন প্রকার নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি প্রদর্শন করে না। ধর্ম এটা চায় না যে জীবনের অন্যান্য দিকগুলো অপর কোন 'খোদার' আইন বিধান ও অনুষ্ঠানাদির আলোকে পরিচালিত হবে। আল্লাহ-নির্দেশিত ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা সাধনার পথ এড়িয়ে পারলৌকিক জীবনে জান্নাতবাসী হবার অপর কোন পথ দেখাবার জন্যে ধর্ম অবতীর্ণ হয়নি।

অবতীর্ণ ধর্মের এটা প্রকৃতি নয় যে তা একটা খেলনা, একটা তুচ্ছ, বিকৃত ও ভয়ংকর ছায়াকৃতি অথবা বাস্তব জীবনযাত্রার সাথে মিলহীন গতানুগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমষ্টি হয়ে থাকবে। অবতীর্ণ হোক বা মানব রচিত হোক কোন ধর্মই এই অর্থহীন দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করতে পারে না। নেতিবাচকতার এই ব্যাধি ধর্মকে কলুষিত করতে এলো কোত্থেকে? জীবন ও ধর্মের মধ্যকার এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যবধান কি করে সৃষ্টি হলো।

এই প্রচণ্ড নেতিবাচক আচরণ একটা দুঃখজনক পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়েছে এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব রেখে গেছে গোটা ইউরোপে। যেখানেই পাশ্চাত্য চিন্তা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জীবন পদ্ধতি গিয়েছে, সেখানেই এই ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান হতে বিচ্যুত হবার পর মানুষ নিজেদের আবিষ্কৃত আজগুবী মতবাদ অনুসরণ করতে শুরু করে। পরিণামে মানুষ এমন এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় নিপতিত হয়েছে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার মতবাদের ব্যর্থতা ও অপর মানুষের শিকারে পরিণত হয়েছে। আরো হতাশাজনক ব্যাপার হলো মানব রচিত নরক হতে মুক্তি প্রচেষ্টায় তার ব্যর্থতা।

'জুডাইজম' একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিল। এরপর আসে খৃস্টবাদ। কিছুটা পরিবর্তিতরূপে এই ধর্ম পূর্বতন ধর্মের জীবন ব্যবস্থাকেই কার্যকর করতে চাইলো। কিন্তু ইহুদীরা ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রতি বৈরীভাব

প্রদর্শন করলো এবং কৃত অন্যায়ের প্রতিবিধানের তিনি যে ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন তা বর্জন করলো। আল-কুরআন বর্ণনা দিচ্ছে যে তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "আমার পূর্বে যে বিধান ছিলো তার সত্যতা ঘোষণার জন্যে আমি এসেছি এবং যে অংশটুকু তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো তা বৈধ করতে এসেছি। আমি তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে একটা নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।" –আলে ইমরান।

ইহুদীগণ ঈসা আলাইহিস্ সালামের কথা মানলো না। বিনয়, শান্তিপ্রিয়তা এবং আত্মিক সংশোধনের জন্যে তিনি ইহুদীদেরকে উপদেশ দিলেন। উপদেশ দিলেন মনগড়া ও আজগুবী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বর্জনের। ইহুদীরা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। পরিশেষে তারা ফিলিস্তিনে নিযুক্ত রোমান গভর্ণর 'পনটিয়াস পাইলাট'-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে ক্রুসে বিদ্ধ করে ঈসা ইবনে মরিয়মকে হত্যার চক্রান্ত করলো। ঈসা আলাইহিস্ সালামের মৃত্যু-সময় তখনও আসেনি। আল্লাহ তাঁকে নিজ সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়ে হিফাজত করলেন।

ইহুদী এবং ঈসা আলাইহিস্ সালামের অনুসারীদের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করলো। ইহুদী সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত এলাকার নব দীক্ষিত খৃস্টানদের মনে ইহুদীদের প্রতি কোন অনুরাগ ছিলো না। ইহুদীরাও এদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করতো। ক্রমশঃ এই দু'সম্প্রদায়ের দূরত্ব বাড়তে থাকলো। 'জুডাইম' থেকে 'খৃস্টবাদ' সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয়ে গেলো। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ের খৃস্টানেরা সামান্য রদবদল সহ জুডাইজমই অনুসরণ করতো। ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা থেকে বুঝা যায় পূর্বতন ধর্মের নীতিমালায় অধিকতর আত্মিক সচেতনতা সংযোগ করাই খৃস্টবাদের কাজ ছিলো।

জুডাইজম থেকে খৃস্টবাদের বিচ্ছেদের ফলে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' থেকে খৃস্টীয় বাইবেল আত্মপ্রকাশ করলো এবং এটাকে পবিত্র গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা হলো। খৃস্টীয় বিধান মূসা আলাইহিস্ সালামের আইন তথা জুডাইজম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে গেলো। পরিণামে যেসব স্বর্গীয় নীতিমালা জাগতিক জীবনের বিধি বিধান নিয়ন্ত্রণ করতো সেগুলো থেকে খৃস্টবাদ দূরে সরে গেলো। খৃস্টবাদ যদি ঈসা ইবনে মরিয়মের স্থাপিত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে এটা বিশ্ব-জাহানের মাঝে মানুষের পজিশন ও জীবনের অন্যান্য রহস্যাবলীর ব্যাখ্যাদান করতে পারতো। এটা তখন খৃস্টানদেরকে মূসা আলাইহিস্ সালামের আইনগুলোর দিকে টেনে আনতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো খৃস্টানগণ একদিকে ইহুদী এবং অপরদিকে ধর্মহীন রোমানদের হাতে নির্যাতিত হতে

লাগলো। এই নির্যাতনের কারণে খৃস্টানগণ দীর্ঘকালের জন্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলো। গোপনভাবে তারা ধর্মপ্রচার করতো। এই অবস্থায় নিপতিত হয়ে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের এখানে-ওখানে পরিবর্তন করে বসলো। ঈসা ইবনে মরিয়মের জীবনেতিহাসের যথার্থ প্রমাণ পেশ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে সেগুলোর বেখাপ্পা ব্যাখ্যা দান করে বসলো। এর ফলে অবতীর্ণ ইঞ্জিল এবং নানা উৎস হতে সংগৃহীত ঈসার (আ) জীবনালেখ্য সংমিশ্রিত হয়ে গেলো। এই পাঁচমিশেলী রচনাকে অবতীর্ণ গ্রন্থরূপে প্রচার করা হলো। অথচ এর বেশীর ভাগই ঈসার (আ) সাথীদের নিজস্ব কথা এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এই মিশ্রণের ফাঁকে ফাঁকে আবার অবতীর্ণ গ্রন্থের অংশও রয়েছে। গ্রন্থটির সবচে' বেশী পুরনো কপিটি রচিত হয়েছিলো একটি পুরো খৃস্টীয় জেনারেশন অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর। খৃস্টান ঐতিহাসিকরা এর গ্রন্থনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। ঈসায়ী ৪০ থেকে ৬৪ সালের মধ্যে তাঁরা এর গ্রন্থনার লগ্ন নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম কোন্ ভাষায় লিখিত ছিলো তা নিয়েও মতিবিরোধ রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর একাধিক ভাষার অনুবাদ দেখতে পেয়েছিলেন।

অ-ইহুদী বংশীয় লোকদের কাছে খৃস্টবাদ প্রচারের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে 'সেন্ট পলকে' ধরা হয়। তিনি ঈহুদী পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং রোমান চিন্তাধারায় বর্ধিত হয়েছিলেন। পরে তিনি খৃস্টবাদ গ্রহণ করেন। খৃস্টবাদ সম্পর্কে সেন্ট পল-এর ধারণা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক দর্শন এবং রোমান পৌরাণিক কাহিনীর অংশবিশেষের সংমিশ্রণ। প্রাথমিক যুগে যুলুম নির্যাতন চলার কারণে খৃস্টবাদের মূল উৎসগুলোর অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের সুযোগ ছিল না। এটা ছিলো খৃস্টবাদের একটা দুর্ভাগ্য। পরবর্তীকালে সেন্ট পল-এর মনগড়া বিশ্লেষণ খৃস্টবাদের উপর নবতর দুর্যোগ ডেকে আনলো।

আব্বাস আল আক্কাদ লিখেন, "পল খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর তাঁর রচনাগুলো লিখেন। এই লিখাগুলোতে ধর্মীয় বক্তব্য ও পৌরাণিক দর্শন মিশ্রিত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে অবতারবাদ সম্পর্কিত অংশে। তিনি বলতেন : 'ঈসা আল্লাহর ডানদিকে বসে তাদের জন্যে প্রার্থনা করছেন যাদের মংগল তিনি চান যাতে আল্লাহর বাণী তাদের মাঝে অবস্থান করে।' তিনি আরো বলতেন : তিনি তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং তাদেরকে জানাচ্ছেন যে তিনি যখন আবার পৃথিবীতে আসবেন তখন তারা গৌরব অর্জন করবে।' পলের এসব বক্তব্য থেকে এটা মনে হয় তিনি ঈসা আলাইহিস সালামের

ত্বরিৎ পুনরাবির্ভাব আশা করতেন এবং তিনি কখনো কখনো তাকে 'আমাদের প্রভু ঈসা মসিহ' বলে উল্লেখ করতেন। এমনকি তিনি নিজেকে ঈসা মসিহর বার্তাবহ বলে আখ্যায়িত করতেন।"

কিন্তু সবচে' বড়ো সর্বনাশ হলো খৃস্টবাদের বিজয় বলে যে ঘটনাকে উল্লেখ করা হয় তা সংঘটিত হবার পর। পরাক্রমশালী রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। ৩৫৫ খৃস্টাব্দে খৃস্টানগণ শাসক দলে পরিণত হলো। আমেরিকার অন্যতম লিখক ড্রেপার এই ঘটনা এবং এর পরিণতি তাঁর Science and Religion গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে রোমান সাম্রাজ্যে উচ্চপদের অধিকারী মুনাফিকদের কারসাজিতে খৃস্টবাদে পৌত্তলিকতা এবং বহুত্ববাদ অনুপ্রবেশ করে। উচ্চপদের অধিকারী ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে খৃস্টান নামে প্রচার করতো। কিন্তু ধর্মের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও অনুরাগ ছিলো না। নামকাওয়াস্তে খৃস্টান সম্রাট কনস্ট্যানটাইনও ছিলেন এই ধরনের একজন। দমননীতি এবং লাম্পট্যই ছিলো তাঁর জীবনের ধর্ম। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় জীবনের শেষ ক'টি দিন ছাড়া সারা জীবন তিনি গীর্জায় গমন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।

খৃস্টানগণ কনস্ট্যানটাইনকে সম্রাট পদে বহাল রাখার মতো শক্তি অর্জন করেছিলো। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তারা ছিলো বড়োই দুর্বল। খৃস্টবাদ বিপরীতমুখীন অনেক মূল্যমানের সংমিশ্রণের ফলে আপন বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত খৃস্টবাদ এবং রোমানদের ধর্ম-বিবর্জিত জীবনধারার একটা জগাখিচুড়ী ধর্ম নামে প্রচলিত হলো। এ ক্ষেত্রে ইসলাম অবশ্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলাম পুরোপুরিভাবে পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করতে পেরেছিলো এবং এর নীতিগুলোকে নিখুঁত, নির্ভেজাল ও সুস্পষ্টভাবে পরিবেশন করতে পেরেছিল।

সম্রাট কনস্ট্যানটাইন ছিলেন লালসার দাস। ধর্মের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিলো না। নিজের স্বার্থে এবং দু'টো বিবদমান মতবাদের স্বার্থে তিনি সমঝোতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো খৃস্টানগণ তাঁর এই কার্যক্রমের বিরোধিতা করতে পারেনি। হয়তো বা তারা বিশ্বাস করতো যে তাদের এই নতুন ধর্ম রোমানদের ধ্যান-ধারণার সাথে মিলিত হলে অধিক লাভবান হবে এবং কালক্রমে পৌত্তলিকতার অসারতা প্রমাণ করে তা পরিহার করা যাবে।

কিন্তু খৃস্টবাদ মিথ্যা খোদা-পরস্তীর অপবিত্রতা থেকে আর কোনদিন পরিত্রাণ

পায়নি। নিষ্ঠাবান খৃস্টানগণ এই পরিত্রাণ কামনা করতেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অসহায়। খৃস্টবাদ পৌত্তলিকতার আবর্তে নিজকে হারিয়ে ফেলে।

বর্ণভিত্তিক ও রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিলো খৃস্টবাদের আরেক বিপদ। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে একে অনেক মৌলিক বিষয়ে আপোষ করতে হলো। আলফ্রেড বাট্লার তাঁর Arab Conquest of Egypt বইতে লিখেছেন যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী রোমান ও মিসরীয়দের সংঘাতের যুগ ছিলো। এই সংঘাতের মূলে ছিলো বর্ণগত বৈষম্য ও ধর্মীয় মত-পার্থক্য। বর্ণগত বৈষম্যের চেয়েও ধর্মীয় বিরোধ ছিলো অধিকতর প্রকট। সেই সময়কার বড়ো সমস্যা ছিলো 'রয়্যালিস্ট' ও 'মনোফিসাইটদের' পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। প্রথম দলটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও রাজার সমর্থক ছিলো। তারা ঈসা ইবনে মরিয়ামের দ্বিত্ব প্রকৃতিতে বিশ্বাসী ছিলো। দ্বিতীয় দলটি ছিলো মিসরীয় 'কপ্ট'দের। এরা প্রথম দলটির ধর্মীয় বিশ্বাসকে অস্বীকার করতো এবং চূড়ান্ত গোঁড়ামী ও তীব্রতা নিয়ে তার বিরোধিতা করতো। এই বিরোধ এতো তীব্র ছিলো যে কোন বিবেকবান জাতির মধ্যে তা আর কোনদিন দেখা যায়নি।

টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড তাঁর The Call of Islam গ্রন্থে এই রাজনৈতিক ও গোত্রীয় বিরোধের এবং তার পরিণতিতে খৃস্টবাদের নবায়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ওপর মন্তব্য করেছেন। এই প্রসংগে তিনি লিখেছেন যে ইসলামের আবির্ভাবের এক শ' বছর পূর্বে 'জাস্টিনিয়ান' তাঁর সাম্রাজ্যে মোটামুটি একটা ঐক্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে সেই ঐক্য উবে যায় এবং সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের অনুগত রাখার জন্যে এক মজবুত বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

'হিরাক্লিয়াস' কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সিরিয়াকে একত্রিত করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাবলী ঐক্যের বদলে অনৈক্য সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত করলো। দেশপ্রেমের বিকল্প হিসেবে ধর্মীয় চেতনা ছাড়া আর কিছুই বাকী ছিলো না। কাজেই জনগণকে শান্ত করা যাবে এমনভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যাদান করে তিনি বিবদমান দলগুলোর মতানৈক্য দূর করতে চাইলেন। তিনি চেষ্টা করলেন সনাতন গীর্জা ও ধর্ম বর্জনকারীদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে। চেষ্টা করলেন এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মাঝে একটা মিল গড়ে তুলতে।

ঈসায়ী ৪৫১ সালে The Council of Chalcedon ঘোষণা করলো যে ঈসা আলাইহিস্ সালামকে স্বর্গীয় এবং মানবিক এই দু'প্রকৃতির দিক দিয়েই মানতে

হবে। কাউন্সিল ঈসাকে 'সত্য খোদা' এবং 'সত্য-মানুষ' রূপে গ্রহণ করলো এবং একই দেহ, একই সত্তায় তা মিলিত রয়েছে বলে ঘোষণা করলো। কাউন্সিল দেখালো যে খোদা, তাঁর পুত্র এবং তাঁর বাণী একই সত্তায় সম্পৃক্ত।

'আর্নল্ড' তাঁর বিশ্লেষণে আরো বলেন যে 'জেকোবাইট সম্প্রদায়' এই ঘোষণা বর্জন করে। তারা দাবী করে যে ঈসা আলাইহিস্ সালাম স্বর্গীয় ও মানবীয় গুণাবলীয় অধিকারী বিভিন্ন সত্তার যৌগিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রথম যুগের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি এবং পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক সাফল্য খৃস্টবাদকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এই প্রভাববশতঃ খৃস্টবাদ ক্রমশঃ পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়। আদর্শিক মতবাদ কুহেলিকাপূর্ণ হয়ে পড়ে। এতো সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে খৃস্টবাদ জীবনসত্তা এবং স্রষ্টার সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো। বাস্তব অস্তিত্ব, স্রষ্টার গুণাবলী, মানবজীবন এবং মানবজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে খৃস্টবাদ সঠিক পথ-নির্দেশ করতে পারলো না।

০ ০ ০ ০

আদর্শিক মতবাদ বিলুপ্ত হলো। কিন্তু ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটলো না। আরো অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা-প্রবাহ পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে থাকলো।

গীর্জার পরিচালকেরা রোমানদের বিলাসী ও অমিতাচারী জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন। খৃস্টবাদের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই রোমানদের জীবনযাত্রা চরমভাবে অনৈতিক হয়ে পড়ে।

ড্রেপার Science and Religion গ্রন্থে এই অধঃপতনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেন যে রোমান সাম্রাজ্য যখন সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে, রোমান সভ্যতা যখন সুবিকশিত, তখন কিন্তু রোমানরা নৈতিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে অতি নিম্নে নেমে গিয়েছিলো। তারা দুশ্চরিত্র ও লালসাপ্রিয় হয়ে পড়েছিলো। এই পৃথিবীর জীবনকে ইন্দ্রিয়-ভোগের সুযোগরূপেই তারা গ্রহণ করেছিলো। তারা মনে করতো যে একজন ব্যক্তির যত বেশী সম্ভব বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করা উচিত। সাময়িক সংযম এবং উপবাস আত্মিক উৎর্ষের পরিবর্তে তাদের লোভ-লালসাকেই আরো বাড়িয়ে তুলতো। তাদের টেবিলগুলো স্বর্ণখচিত ছিলো। রূপার বাসন-বাটি মণি-মুক্তা

খচিত ছিলো। তাদের চতুর্দিকে থাকতো মূল্যবান পোশাক পরিহিত দাস। যৌন ক্ষুধা উদ্রেকের জন্যে পার্শ্বে থাকতো অর্ধ উলংগ বালিকাদল। তাদের বিলাসী স্নান-পর্ব ছিলো উল্লেখযোগ্য। কুস্তি ও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে তারা মেতে থাকতো। একে অপরের সঙ্গে অথবা সিংহের সাথে লড়াই করে তারা আনন্দ পেতো। নিজের দেহের রক্তে সর্বাংগ সিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এসব কুস্তি ও লড়াই থেকে বিরত হতো না। দিগ্বিজয়ী বীরেরা বিশ্বাস করতো যে পৃথিবীতে পূজনীয় জিনিষ একটাই আছে। তা হচ্ছে শক্তি। শক্তির বদৌলতে একজন আরেক জনের সারা জীবনের কষ্টার্জিত সব সম্পদ কুক্ষিগত করতে পারে। লড়াইয়ের ময়দানে বিজিত ব্যক্তির সব সম্পদ দখল করতে পারে। পরাজিত ব্যক্তির উপর করভার চাপাতে পারে। তারা বিশ্বাস করতো যে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন অপরাজেয় শক্তির প্রতীক। আর রোমানদের জীবনে প্রতিবিম্বিত হতো জাঁকজমকপূর্ণ রাজসিক রেওয়াজ। গ্রীক সভ্যতার পতন যুগেও গ্রীকগণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। রোমান-জীবনের উচ্ছৃংখলতা ও কুকুর-সুলভ যৌন-লালসা প্রদমনের জন্যে গীর্জা থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছিলো। প্রচেষ্টা চলছিলো এই সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের কিন্তু কার্যকরভাবে এই সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা গীর্জা আগেই হারিয়ে ফেলেছিলো। গীর্জা তো তখন ন্যায়নিষ্ঠ খৃস্টীয় আদর্শিক মতবাদ বিচ্যুত। যে মতবাদ দ্বারা গীর্জা মানুষের চরম আচরণগুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে ইনসাফ কায়েম করতে পারতো সেই মতবাদ তো অনেক আগেই বর্জিত হয়েছিলো।

এই ঘৃণ্য জীবনধারার প্রতিক্রিয়ারূপে অচিরেই গীর্জা কেন্দ্রিক এক কঠোর বৈরাগ্যবাদ আত্মপ্রকাশ করলো যা পলায়নপর রোমান নাস্তিকতাবাদের অসভ্যতার চেয়ে আরো বড়ো রকমের বিপর্যয় নিয়ে এলো মানুষের জীবনে। কৃচ্ছ্রতা, সম্পদবিমুখতা এবং চির-কৌমার্য জীবনের কল্যাণশীল অংগ হয়ে দাঁড়ালো। মানব জাতির অস্তিত্ব, মানব সভ্যতা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ্য ও উদ্ভাবনী শক্তিগুলোকে কঠোরভাবে দমন করা হলো। মানব প্রকৃতি থেকে এই বিচ্যুতিকে আবার মানব জীবনের পূর্ণত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হলো। একে গ্রহণ করা হলো সাধুতা ও ধার্মিকতা নাম দিয়ে। অথচ এই বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতা আল্লাহ কোনদিন চাননি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্যেও এর কোন প্রয়োজন নেই।

বৈরাগ্যবাদ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারলো না। পক্ষান্তরে, এটা দু'টো চরম দৃষ্টিভংগি সম্পন্ন দলগুলোর মধ্যে সৃষ্টি করলো নতুন সংঘর্ষ। দু'টোই

ছিলো মানব জীবনের সত্যিকার প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন। 'ডব্লিউ. লেকী' History of European Morals বইতে এই সময়কার খৃস্টান-জগতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে বৈরাগ্যবাদ এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পাশাপাশি অবস্থান করছিলো। সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিলো চরম অনৈতিকতা ও চরিত্রহীনতা। বেশ্যাবৃত্তি, লালসা চরিতার্থকরণ, রাজা, রাজকুমার ও বিত্তশালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, বিলাস-ব্যসন, দামী অলংকার ব্যবহার এসব ছিলো সমাজে বহুল প্রচলিত।

গোটা সমাজ চরম অমিতাচার এবং চরম বৈরাগ্যবাদের মাঝে দোদুল্যমান ছিলো। যে শহরগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈরাগ্যবাদী যাজক বসবাস করতো, সেই শহরেই সর্বোচ্চ সংখ্যক বেশ্যাদের আড্ডা দেখা যেতো।

খৃস্টীয় পুরোহিতবাদ থেকে বৈরাগ্যবাদ সৃষ্টি। আর এই পুরোহিতবাদ আর খৃস্টবাদ এক ছিলো না। এটা ছিলো খৃস্টবাদ থেকে বিচ্যুত নতুন ব্যবস্থা। এই কারণে বৈরাগ্যবাদ খৃস্টান জগতের জন্যে একটা নৈতিক বিধানরূপেও তার ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বরং তা মানুষের মনে ধর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করলো যদিও প্রকৃত ধর্মকে এজন্য দায়ী করা চলে না। মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ বৈরাগ্যবাদের প্রতি একটা বিদ্রোহী মনোভাব উসকিয়ে দেয়া হলো। এ থেকেই বুঝা যায় এই বৈরাগ্যবাদ কি করে ব্যক্তি-সত্তার অবক্ষয়, ব্যক্তিত্বের চরম বিপর্যয় ও নেতিবাচক প্রচণ্ডতার জন্ম দিলো।

যারা জান্নাত বঞ্চিত হবার ভয়ে এই কষ্টকর নিভৃত জীবন যাপন করছিলো তারা যখন টের পেলো যে ধর্ম-যাজকদের ব্যক্তিগত জীবন আসলে বিলাস-ভোগ এবং বিকৃত ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় ভরা তখন একটা ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো।

পাপ-মুক্তির সার্টিফিকেট গোড়ার দিকে গীর্জা থেকে ইস্যু করা হতো। এই অধিকার গীর্জার লোকেরা পেয়েছিলো 'ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল' থেকে। এই কাউন্সিল খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতো। দ্বাদশ ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল ঘোষণা করলো যে যেহেতু ঈসা আলাইহিস্ সালাম গীর্জার ওপর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন এবং যেহেতু গীর্জা খৃস্টানদের মধ্যে প্রথম থেকেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসছে, সেহেতু খৃস্টান জনগণের মুক্তির জন্যে আগামী দিনগুলোতেও এই নিয়ম অনুসরণ করতে থাকবে। কাউন্সিল আরো সিদ্ধান্ত নিলো যে যদি কোন ব্যক্তি এই সার্টিফিকেট নিরর্থক বলে অভিযোগ করে অথবা গীর্জার এই অধিকার অস্বীকার করে তাহলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে। অবশ্য সাথে সাথে এই সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিলো যে

এই ক্ষমতা ভেবে চিন্তে প্রয়োগ করা হবে যাতে যাজকীয় নির্দেশের অপব্যবহার না হয়।

ধর্মের নামে কৃচ্ছ্রতা ও সংযমের প্রতি গীর্জার কঠোর মনোভাবের সাথে যখন এই সার্টিফিকেট প্রথা যোগ করি এবং পাদ্রীদের একান্ত জীবনের নৈতিক দুর্বলতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তুলনা করি তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি কি দুঃসহ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি আচরণে প্রচণ্ড নেতিবাচকতা সৃষ্টি হয়েছিলো যা ইউরোপকে কলংকিত ও বেদনাহত করেছে।

০ ০ ০ ০

এখানেও এই কাহিনীর শেষ নয়। গীর্জার লোকেরা রাজা ও সম্রাটদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উত্থাপন শুরু করলো। অভিযোগগুলো কেবল ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। রাজনৈতিক প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও মুকদ্দমা শুরু হলো। পুরাদমে চলতে থাকলো এই বিবাদ। প্রথম দিকে পোপ বিজয়ী হলেন। চতুর্থ হেনরী সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে "কাসল অব ক্যানোসা"-তে গিয়ে পোপের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হলেন। এটা ছিলো ১০৭৭ সালের ঘটনা। যে পর্যন্ত না রাজদরবার বিনীত অনুরোধ জানালো সেই পর্যন্ত পোপ হেনরীকে তাঁর কাছে যেতে অনুমতি দেননি। অতঃপর হেনরীকে নগ্নপদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। হেনরী মোটা উলের পোশাক পরে প্রবেশ করলেন এবং অনুশোচনা জ্ঞাপন করলেন। পোপ সেই অনুশোচনা অনুমোদন করলেন। পোপতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত পোপ সম্রাটের দ্বন্দ্ব অবিরত চলছিলো।

রাষ্ট্রনায়কদের সাথে লড়াই চলাকালে পুরোহিতগণ জনগণের উপর করভার বৃদ্ধি করলো। করভারে অতিষ্ঠ জনগণ গুঞ্জরণ শুরু করলো। তাদের দুর্ভোগ বেড়েই চললো। জনগণের এই অসন্তোষকে পুঁজি করলো রাষ্ট্রনায়কেরা। তাঁরা জনগণকে গীর্জার শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এক্ষেত্রে তাঁরা পাদ্রীদের গোপন পাপাচার ও অমিতাচারের কাহিনী জনসমক্ষে ফাঁস করে দিলেন। পাদ্রীসুলভ পোশাকের আড়ালে যে লাম্পট্য আত্মগোপন করেছিলো তা জনগণের সামনে নগ্ন হয়ে গেলো। এটা ছিলো একটা চরম আঘাত। এর পরিণতিতে ভয়ানক নেতিবাচকতা আত্মপ্রকাশ করলো যার ফলে ইউরোপে ধর্ম এবং জীবনের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের সব সম্ভাবনা বিলীন হয়ে গেলো। ধর্মীয় মতবাদ এবং সমাজ

ব্যবস্থা পৃথক হয়ে গেলো। নিজ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এটা ছিলো পাশ্চাত্য গীর্জার সবচে' বড়ো অপরাধ। এই অপরাধ সে করেছে খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর সব অবতীর্ণ ধর্মের বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত এর জের শেষ হয়নি।

এই অপরাধমূলক কাজ কি করে সংঘটিত হলো? প্রথমত ধর্মযাজকেরা বাইবেলের সমঝ ও ব্যাখ্যাদানের সব অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিলো। গীর্জার বাইরের কোন চিন্তাবিদ এই গ্রন্থ মূল্যায়ন করার অধিকারী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসে এমন সব কথা সংযোজন করা হলো যেগুলো ছিলো দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য। ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে তাদের আজগুবী চিন্তার কথা আর্নল্ড সাহেবের উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুট। এসব অস্পষ্ট মতকে তারা 'স্বর্গীয় রহস্য' আখ্যা দিয়েছিলো। এগুলোকে উপাসনা পদ্ধতিতে সংযোজিত করলো। উদাহরণ স্বরূপ 'ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অনুষ্ঠানে রুটি ও মদকে ঈসার শরীর ও রক্ত জ্ঞান করা হয়। মার্টিন লুথার, জন ক্যালভিন এবং উলরিখ উইংলী (Ulrich Zwingli) এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে প্রোটেস্টানটিজমের জন্ম দেন। ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানটি খৃস্টবাদের একটা নতুন সংযোজন। অবতীর্ণ গ্রন্থে, খৃস্টবাদের প্রাথমিক ইতিহাস অথবা ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিলের কোন ঘোষণায় তার উল্লেখ নেই।

আসল ব্যাপার ছিলো যে খৃস্টানেরা 'ইস্টার' উৎসবে চিরাচরিতভাবে রুটি খেতো এবং মদ পান করতো। এটাকে তারা প্রভুর সান্ধ্য-ভোজ নামে অভিহিত করতো। পরবর্তীকালে গীর্জা বললো যে এই রুটি এবং মদ ঈসার প্রকৃত দেহ ও রক্তের রূপ লাভ করে। খৃস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি এই রুটি ও মদ গ্রহণ করবে সেই ব্যক্তি প্রভুর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। গীর্জা এই মত খৃস্টানদের ওপর চাপিয়ে দিলো এবং এর বিচার বিশ্লেষণ নিষিদ্ধ করে দিলো। বলা হলো এই বিষয় কেউ আলোচনা করলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে।

ধর্মে এসব অবাস্তব ভুল বিশ্বাস ঢুকানো হলো। এগুলোর উৎস অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। তারপর গীর্জা আরেক কদম এগিয়ে গেলো। জীবন ও জগত সম্বন্ধে অনেক আজগুবী থিউরী ধর্ম বিশ্বাসের নামে প্রচার করা শুরু হলো। সমসাময়িক কালের কতিপয় ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক থিউরী ধর্মে ঢুকানো হলো। এগুলোর বেশীর ভাগই ছিলো ভ্রান্তি ও কল্পনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এগুলোর আলোচনা, সংশোধন, অস্বীকৃতি এবং বিকল্প তালাশ করা ছিলো অবৈধ।

এটাই ছিলো খৃস্টবাদের উপর শেষ আঘাত। কেননা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক এই মতগুলো সামান্য পরীক্ষণের মাধ্যমে হতো পরিত্যক্ত।

আল্লাহ মানব মনে জ্ঞান-পিপাসা দিয়েছেন। চিন্তাশীল মানুষ সবকিছুর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী। এই জ্ঞান পিপাসার পথে বাধাদানও অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। 'এ. নদবী' তাঁর What the world lost by Muslim Decadence গ্রন্থে লিখেন, "ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের একটা বড়ো রকমের ভুল তথা ধর্মের বিরুদ্ধে কৃত বড়ো রকমের অপরাধ এই ছিলো যে তারা ধর্মগ্রন্থে মানবিক জ্ঞান এবং ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমসাময়িক অবগতি সংযোজন করে নিয়েছিলো। এসব অবগতি ছিলো অপ্রতুল। এই সীমিত জ্ঞানকেই সেদিন চূড়ান্ত জ্ঞান রূপে গ্রহণ করা হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে কোন এক কালের অর্জিত সর্বোচ্চ জ্ঞানকেও চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, মানুষের জ্ঞান সদা বর্ধনশীল। ধর্মকে যদি এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ো তোলা হয়, তবে তো সেই ধর্ম ধ্বংসপ্রবণ বালুকাস্তূপের ওপরে রচিত একটা কাঠামো বৈ কিছু নয়। পাদ্রী পুরোহিতেরা সদিচ্ছা নিয়েও এসব অবগতি ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত করে থাকতে পারে। কিন্তু এভাবে তারা নিজেদের এবং ধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ এই জোড়াতালি বিজ্ঞান, যুক্তি এবং ধর্মের মধ্যে একটা সংঘাত সৃষ্টি করেছে। পরিণামে ধর্মকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এই পরাজিত ধর্মটি ছিলো এমন এক ধর্ম যার মধ্যে সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেছিলো। এই ধর্মের অনুসারীরা পরাজিত হলো এবং তারা আর কোনদিন তাদের গৌরব ও সম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। এর পরবর্তী ফল হলো আরো খারাপ। সারা ইউরোপ ধর্ম বিরোধী মোড় নিলো। নাস্তিকতাবাদ আত্মপ্রকাশ করলো।"

"তদুপরি ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত ভূগোল ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কতিপয় ব্যাখ্যার সাথে ধর্মযাজকগণ তৎকালীন প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান যোগ করলো। এই জ্ঞানকে তারা ধর্মীয় রং দিল এবং একে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করলো। এই সম্পর্কে ধর্মযাজকদের লিখা বই-পুস্তক বের হলো। তৎকালীন আজগুবী ভূগোল জ্ঞানকে 'খৃষ্টীয় ভূগোল' আখ্যা দেয়া হলো। এই জ্ঞান যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারতো না তাকে 'অধার্মিক' বলা হতো।"

এই সময়ে ইউরোপে যুক্তি প্রবণতার উন্মেষ ঘটছিলো। বিজ্ঞানীরা ধর্মীয় ঐতিহ্য ভেংগে ফেলছিলো। তারা খৃস্টীয় ভূগোলের কড়া সমালোচনা করলো এবং তা প্রত্যাখ্যান করলো। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ধর্ম বিশ্বাস সাংঘর্ষিক হয়ে পড়লো। বিজ্ঞানীরা ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকলো। এতে গীর্জা ক্রুদ্ধ হলো। গীর্জার নেতৃবৃন্দ বিজ্ঞানীদেরকে ধর্মত্যাগী বলে ফতোয়া দিতে শুরু করলো। পোপগণ 'ইনকুইজিশন কোর্ট' স্থাপন করলেন। পোপদের কথায় এই

কোর্টগুলো 'শহর, বন্দর, জংগল, গুহা ও মাঠে ছড়ানো নাস্তিকদের' শাস্তি বিধানের জন্যে গঠিত হয়েছিলো। এই কোর্টগুলো কালক্ষেপণ না করে খৃস্টান জগত থেকে যেকোন শত্রুকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে দারুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করলো। সারা দেশে গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে দেয়া হলো। প্রতিটি কাজের খোঁজখবর রাখা শুরু হলো। প্রতিটি নতুন চিন্তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। লোকদেরকে তাদের কাজের মতলব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। একজন খৃস্টীয় ধর্মবেত্তা বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক পন্থায় কেউ খৃস্টান হতে এবং মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম ছিলো না।'

"এক হিসেব মতে জানা যায় যে এসব কোর্ট-দণ্ড পেয়েছিলো তিন লক্ষ ব্যক্তি। এদের মধ্যে ৩২ হাজার ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। জীবন্ত দগ্ধ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী 'ব্রুনো'। তাঁর 'বহু জগত' সম্পর্কিত মতবাদ গীর্জার নেতৃবৃন্দের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তাঁকে এক ফোঁটা রক্তপাত ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার অর্থ ছিলো জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী 'গ্যালিলিও' বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। এই বিশ্বাসের কারণে তাঁকে জীবন দিতে হলো।"

"এই পর্যায়ে এসে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং সংস্কারকগণ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তাঁরা গীর্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। গীর্জার সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট ছিলো, সবকিছু তাঁরা বর্জন করলেন। বর্জন করলেন গীর্জার ধর্ম-বিশ্বাস অথবা শিক্ষা, গীর্জার বিজ্ঞান অথবা নৈতিক মূল্যমান। খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা দ্বারা এই কাজ শুরু হলো। পরে সব ধর্মের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ পরিচালিত হলো। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের নেতৃবৃন্দের সাথে খৃষ্টবাদের তথা 'সেন্ট পলের' ধর্মের নেতৃবৃন্দের লড়াই শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের লড়াইতে পরিণত হলো। বিপ্লবীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে ধর্ম ও বিজ্ঞান দু'টো সমঝোতাবিহীন বিপরীত প্রবাহ এবং এই দু'য়ের সহাবস্থান সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি এক সময়ে, যেকোন একটিকেই গ্রহণ করতে পারে। তাদের কাছে ধর্ম আজ বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্যে ধর্মযাজকদের হাতে প্রাণপাতকারীদের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মনে 'ধর্ম' কথাটি শুনে যে দৃশ্য জাগে তা হচ্ছে কঠোর বদন, কুঞ্চিত ভ্রূ-বিশিষ্ট কপাল, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, অসহিষ্ণুতা এবং আহম্মকসুলভ মানসিকতা। ধর্মের কথা শুনেই এদের মন ঘৃণায় ভরে ওঠে এবং ধর্মযাজকেরা যা কিছু বলে তা ঘৃণা করতে ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। এসব ব্যক্তির উত্তরসূরীদের মনেও এই অনুভূতি ও স্মৃতি উত্তরাধিকাররূপে এসে জমা হয়ে রয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এসব বিপ্লবীরাও অধ্যয়ন বিশ্লেষণকালে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার ধৈর্য অবলম্বন করতে পারেনি। ধর্ম ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদের পার্থক্য করার মানসিক সুস্থিরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা তারাও দেখাতে পারেনি। তারা ধর্ম কর্তৃক নির্দেশিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ এবং ধর্মযাজকদের স্বেচ্ছাচার, অনমনীয়তা ও ভুল উপস্থাপনার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়নি। এই পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হলে তারা কোনদিন ঘৃণাভরে ধর্মকে বর্জন করতে পারতো না। ধর্মযাজকদের প্রতি ঘৃণা এবং অপরিণত চিন্তাশক্তি তাদেরকে ধর্মের প্রতি ন্যায়ানুগ মনোভাব প্রদর্শন করতে বাধাগ্রস্তকরেছে।

সাধারণতঃ এই কারণগুলোর পরিণতি রূপে প্রচণ্ড নেতিবাচক মানসিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই মানসিক ব্যাধি আজ ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ইউরোপ গীর্জাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। এই উদাহরণ অনুসরণ করে অন্যান্য স্থানে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনা করে দেখা হলো না। ইউরোপ ভেজাল খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। এই খৃস্টবাদের মূলভিত্তি ও মূল্যমান নানাভাবে দূষিত হয়ে গিয়েছিলো। ইউরোপ গীর্জার লোকদের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো। এসব লোক নিজেদের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিলো। গীর্জার লোকেরা চরম ঘৃণা ও সার্বজনীন শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিলো।

পরিস্থিতিটা মূলতঃ ইউরোপীয়। এটা শুধু একটা বিশেষ ধর্মীয় মতের সাথে সম্পর্কিত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কিত নয়। তদুপরি এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিটা ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায়ে সীমিত। এই সংঘাতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অবহিত না হলে এই অলক্ষুণে পরিস্থিতির প্রভাব মুক্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইউরোপের আত্মা আজ ঐতিহাসিক কারণে মানসিক ও আবেগগত জড়ত্বে আবদ্ধ। যুক্তি ও ধর্মের লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইউরোপীয় মন আজ ব্যক্তিত্বের চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রচণ্ড নেতিবাচকতার শিকার। ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবনসত্তা আজ ব্যাধিগ্রস্ত। তাই বর্ণিত পরিস্থিতির মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখাতে পারে এমন যোগ্যতা আজ ইউরোপের নেই।

শ্বেতাংগদের ভূমিকার পরিসমাপ্তি

ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রেন্ড রাসেল বলেছেন যে শ্বেতাংগদের প্রতিপত্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে। শ্বেতাংগ জাতিগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে না। কারণ এটা স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ। রাসেল বিশ্বাস করতেন যে বিগত চার শতকের মতো সুখের সময় শ্বেতাংগদের জন্যে আর আসবে না। তার মতে শ্বেতাংগ জাতিগুলোর মধ্যে কেবল রাশিয়ানরাই হয়তো এশিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এশিয়ার লোকেরা সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণা করে এবং তাদের ধারণা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নেই। এশিয়ার লোকেরা পাশ্চাত্য জাতিগুলোর শাসনাধীন ছিলো। এরা পাশ্চাত্যবাসীদের রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার ছিলো। রাশিয়ার হাতে এভাবে ব্যবহৃত হবার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। এসব কারণে রাসেল সাহেব ভাবতেন যে এশিয়ায় পাশ্চাত্য দেশগুলোর প্রাধান্যকাল শেষ হয়ে গেছে। তিনি অবশ্য মনে করতেন যে ভারত পাশ্চাত্য ঘেঁষা হয়েই থাকবে। তিনি ধারণা করেছিলেন যে আরব জাহান– মিসর ও পাকিস্তানসহ– কমিউনিস্ট শিবিরে যোগ দেবে।

রাসেল সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৫০ খৃস্টাব্দে। চীনে কমিউনিস্ট সরকার কায়েম হওয়া এবং অপরাপর ঘটনার কারণে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিমত এই যে এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী মানসিকতার একটা অগভীর বিশ্লেষণ। বার্ট্রেন্ড রাসেল উদার চিন্তাধারার জন্যে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, এর আদর্শবাদিতা এবং সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এগুলো একজন চিন্তাবিদের বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বব্যাপক পর্যালোচনার পথে বাধা হয়ে থাকে এবং নতুন কোন দৃষ্টিকোণ নিয়ে এগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

শ্বেতাংগদের শাসনকাল সমাপ্ত। কারণ তাদের সভ্যতার সীমিত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অনুসন্ধিৎসু মানব মনকে দেবার মতো কোন বাস্তবধর্মী ধারণা, চিন্তা, নীতি ও মূল্যমান এই সভ্যতার কাছে আর বাকী নেই। প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্যে মানব জাতিকে এই সভ্যতা আর কিছু দিতে সক্ষম নয়। গ্রেট ব্রিটেনে ম্যাগনাকার্টার ফলশ্রুতি-কালে ফ্রান্স বিপ্লবের পরিণতি এবং আমেরিকাতে গণতান্ত্রিক পরীক্ষার ফল হিসেবে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদানের পর এই

সভ্যতা বন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই মূল্যবোধ যদিও অর্ধবিকশিত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সমৃদ্ধ হচ্ছিলো।

কিন্তু এগুলো গতিশীল মানব সমাজের জন্যে যথেষ্ট ছিলো না। ইউরোপে এসব মূল্যবোধের বাস্তবায়নের পরও দেখা গেলো এগুলো মানুষের চলার পথের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট নয়।

এই সভ্যতা তার মূল উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো যে উৎসের সাথে সংযোগ রক্ষা না করতে পারলে সমাজ ব্যবস্থা, নীতিমালা এবং মূল্যবোধ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে না। আর সেই উৎসটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। এই ঈমানই সামগ্রিক অস্তিত্বের ব্যাখ্যাদান করে। বিশ্লেষণ করে মানুষের পজিশন এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য। মূল উৎস হতে বিচ্ছিন্ন এই সভ্যতাটি তাই একটা সাময়িক সভ্যতা। মানব প্রকৃতির গভীরে যা কোনদিন তার শিকড় গাড়তে পারেনি।

স্বর্গীয় উৎস হতে উৎসারিত না হওয়ার কারণে এই সভ্যতা এমন সব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যেগুলো মানব-অস্তিত্ব ও প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো। মৌলিকত্ব ও পদ্ধতির দিক থেকে এই সভ্যতা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনগুলোকে অবহেলাই করেছে যেসব প্রয়োজন মানব-সৃষ্টি ও গঠনের বিশেষত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। যেসব প্রাথমিক মূল্যবোধ মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সেগুলো করা হলো অবহেলা। এগুলো যে কেবল অবহেলাই করা হয়েছে তাই নয়, বরং এগুলো ভীষণভাবে পদদলিত করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই জন্ম নিলো নেতিবাচক আচরণের প্রচণ্ডতা– একটা মানসিক ব্যাধি। এই ব্যাধির ফলে ধর্মকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে আজকের সভ্যতা। মানব জীবনের বাস্তবতার প্রতি বৃদ্ধাংগুল দেখিয়ে মানবীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে এবং ন্যায়নিষ্ঠ মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে এই সভ্যতা সম্মুখে এগুতে থাকলো।

এখেকেই বুঝা যায় এই সভ্যতাকালে মানবতার দুর্গতির কারণ। গোড়ার দিকে এই সভ্যতা মানবতার সেবা, উন্নতি ও কল্যাণের অভিপ্রায় নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলো। পরে তা গতিপথ হারিয়ে ফেলে। কোন সভ্যতা যখন মানব প্রকৃতি বিরোধী হয়, তখন একটা সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতের পরিণতি সেজে আসে বিপত্তি, জান-মালের ক্ষতি, হতাশা-নিরাশা, ধ্বংস ও মৃত্যু। এই সংঘাতের শেষ পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী রূপে এই সভ্যতাই হয় পরাজিত। মানব প্রকৃতি হয় বিজয়ী।

কারণ সভ্যতার ক্রমবিকাশমান পর্যায়গুলোর চেয়ে মানব প্রকৃতি আরো বেশী উন্নত ও স্থায়ী।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে রাশিয়ান, ব্রিটিশ, ফরাসী, সুইডিস, আমেরিকান এবং অন্যান্য সব সাদা আদমীরা একই পর্যায়ের। রাশিয়ানরা বরং বেশী পেছনে। কেননা তাদের স্বৈরাচারী ব্যবস্থাটাই তো পুলিশী নিয়ন্ত্রণ, রক্তপাত, শুদ্ধি অভিযান এবং শ্রম শিবিরে শাস্তি-ব্যবস্থা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। অন্য সব ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির অধিকতর বিরোধী। অস্তিত্ব, জীবন রহস্য ও বিশ্বজগত সম্বন্ধে মার্কসবাদের অজ্ঞতার কথা না-ই বা বললাম। মার্কসবাদ মানবাত্মা, এর প্রকৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। বস্তুগত লাভ ও জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির সংগ্রামে সার্বিক মানবিক কর্মোৎসাহ নিয়োগ করতে মার্কসবাদ চেষ্টিত। মার্কসবাদ সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পেছনে কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতিকেই ক্রিয়াশীল মনে করে। এই মতবাদ ওসব মানবিক মূল্যবোধ বাতিল করে দেয় যেগুলো পশুর ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাসকে পৃথক রূপ দিয়েছে। এই মতবাদ মানুষের সবচে' বড়ো কাজটিকে অস্বীকার করে। মার্কসবাদ স্বীকার করে না যে মানব সত্তাই ইতিহাস বিবর্তনের সর্বপ্রধান ইতিবাচক শক্তি। এই মতবাদ ভবিষ্যতকে মানবিক উত্তরাধিকার বিবর্জিত রূপে অংকন করেছে। ধারণা দেয়া হয়েছে মানুষগুলো সব ফিরিশতা সেজে সামর্থ্য অনুসারে উৎপাদন করবে এবং শুধু নিজের প্রয়োজন মতো পরিমিত সম্পদ গ্রহণ করবে। এই মতবাদ এই ধারণাও ব্যক্ত করেছে যে সব ক্রিয়াকাণ্ড সরকার বা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হবে। এর জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বুর্জোয়া ব্যবস্থা উৎপাটিত হলে এবং সর্বহারাদের নেতৃত্ব কায়েম হলেই মানব-প্রকৃতি ও চরিত্রে এই বিরাট বিপ্লব আপনা আপনি ঘটে যাবে।

মার্কসীয় ঐতিহাসিক মতবাদ মানব-প্রকৃতি এবং মানব-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোকে অবোধগম্য করে তুলেছে। যতদিন পর্যন্ত মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নিরেট অজ্ঞতা বিরাজ করবে এবং যতদিন মার্কসবাদে ওই পৌরাণিক কাহিনী গৃহীত থাকবে, ততদিন কোন বাস্তবমুখীন জীবন ব্যবস্থা আমরা এই মতবাদ থেকে আশা করতে পারি না। আর তাই এই মতবাদ স্বৈরতান্ত্রিক উপায়েই মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে হবে।

মার্কসীয় মতবাদ এবং বাস্তব রূপের মাঝেও আছে আকাশ-পাতালের পার্থক্য।

মূলনীতিগুলো থেকে অনুসৃত নীতিগুলো ভিন্ন মার্কসবাদীরা মার্কসবাদের অতি 'পবিত্র' বক্তব্যকেও বর্জন করেছে। অবশ্য তারা এই বর্জনকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার আপ্রাণ কোশেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে তারা এই খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছে যে মার্কসবাদ ক্রমবিকাশধর্মী। অথচ মার্কসবাদের মতো কড়া গতিহীন ও স্বৈরাচারী মতবাদ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রাকৃতিক আইনের অমোঘ দাবীর কাছে মার্কসবাদের প্রধান নীতিগুলোকে মাথানত করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি এবং এই জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হবার সৌভাগ্য জার আমলেও রাশিয়ানদের হয়েছিলো।

মার্কসবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র উবে যাবার কথা ছিলো। বিগত অর্ধ-শতাব্দীতে সে প্রক্রিয়ার অন্ততঃ সূচনা তো হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু রাষ্ট্র এখনো আছে। দিনের পর দিন তা মোটা হচ্ছে। জনগণের ও তাদের সর্বস্ব রাষ্ট্র গ্রাস করে ফেলছে। মার্কসবাদ অনুসারে স্বাভাবিক পন্থায় সরকার-ব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাবার কথা ছিলো। অথচ আজ একটা শক্তিশালী সরকার অবলম্বন করেই মার্কসবাদকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এখন তো বেঁচে আছে শুধু সরকার। ব্যক্তি, জনগণ এবং মানব-প্রকৃতির বিশেষ অধিকার বেঁচে নেই। এগুলো মার্কসবাদের স্টীম রোলারের নীচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

মার্কসবাদ অবোধগম্য 'বৈজ্ঞানিক' ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়ায় যে পুলিসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা জার আমলেরই পুনরাবৃত্তি। এই পুলিশী ব্যবস্থা সীমিত কালের জন্যে কোন অনুন্নত দেশে প্রবর্তন করা সম্ভব। যেসব দেশ ও জাতি স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে সচেতন, তারা এমন ব্যবস্থা বেশী দিন বরদাশত করতে পারে না। যেসব জাতি এই ব্যবস্থার অবিচারের শিকার তারা সহজাত প্রবৃত্তির তাকিদেই মার্কসবাদ বিরোধী। যদিও তারা অতীতে জার ও অন্যান্য ডিকটেটরদের অধীনে অনেক দিন ছিলো। শক্তি প্রয়োগ না করে এবং দমননীতি অবলম্বন না করে মার্কসবাদ টিকে থাকতে পারে না। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে জীবনাযাত্রার সব উৎস রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করা হয় এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপরে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ চক্রটি হয় সব ক্ষমতার মালিক। বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তরুণ মনকে মার্কসীয় ভাবধারায় গড়ে তোলা হয়। তথ্য বিভাগ ও প্রচার যন্ত্রগুলোও রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য কোন লোককে শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় না। কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্যশীল নয় বলে যাকে মনে হয় তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়া হয়। এই ধরনের অনেক কিছুই সেই সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এতো কড়াকড়ি ও

নির্যাতনের মুখেও মানব প্রকৃতি সে মতবাদের প্রতি ঘৃণাভাব প্রদর্শন করে এবং বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করে। মানব প্রকৃতি দীর্ঘকালের জন্যে এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে না। ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন ছাড়া এই মতবাদ বাঁচতে পারে না, এটাই তো এই মতবাদের ব্যর্থতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

এই বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি যে বার্ট্রেন্ড রাসেলের ভবিষ্যদ্বাণী এক নড়বড়ে ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব সত্য সীমিত বস্তুবাদী মানসিকতার গণ্ডী ডিংগিয়ে সম্মুখে প্রবাহিত হচ্ছে।

অবশ্য সমস্যাটা সুগভীর এবং সিরিয়াস। আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে অবস্থিত একটা সভ্যতার সমস্যা এটি। এটা সামাজিক ব্যবস্থা, চিন্তাধারা এবং জাগতিক মতবাদের সমস্যা। স্বর্গীয় উৎস হতে বিচ্ছিন্ন, মানবজীবনের সঠিক ব্যাখ্যাদানে ব্যর্থ এবং বিশ্বলোকের সাথে মানবজীবনের সম্পর্ক নির্ণয়ে অপারগ মতবাদের সমস্যা এটি।

এটা ভয়ানক নেতিবাচক আচরণের সমস্যা। এই মানসিক ব্যাধিটা, রাশিয়ান, আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, সুইস, সুইডিস ইত্যাদি জাতিসমূহের এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের এটা সাধারণ ব্যাধি। এই জাতিগুলো আজ এক বিপজ্জনক স্থানে পা রেখে দন্ডায়মান।

এসব দেশে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এগুলোর সাধারণ উৎস ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। পুঁজিবাদী আমেরিকায় গীর্জার দ্বার মুক্ত রাখা, কমিউনিস্ট রাশিয়ায় গীর্জা বন্ধ করে দেয়া অথবা সুইডেনের মতো সমাজবাদী দেশে নাস্তিকতাবাদের অবাধ প্রচার ব্যবস্থা করে গীর্জার প্রতি উদাসীনতা দেখানোর মধ্যে বড়ো রকমের কোন পার্থক্য নেই। স্বর্গীয় মতবাদের অণুপ্রেরণায় এগুলোর কোনটাই গড়ে উঠেনি। কাজেই এগুলোর বাহ্যিক পার্থক্য ও সমাজ ব্যবস্থার নানা ঢং আমাদের কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ ধর্মীয় মতবাদই তো সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে, অন্য কোন মতবাদ নয়।

এই মৌলিক উৎস থেকেই সমাজ-ব্যবস্থা ও চিন্তার সঠিক মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব। কারণ এটা মানব-প্রকৃতির গঠন-বৈশিষ্ট ও তার প্রকৃত চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম। এই হলো সমস্যার গভীর ও ব্যাপক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা বার্ট্রেন্ড রাসেলের বর্ণিত বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। রাসেল ছিলেন প্রচলিত বস্তুবাদী সভ্যতার হাতে বন্দী। পাশ্চাত্যের সব দার্শনিকই তাঁদের পরিবেশ ও নেতিবাচক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। পাঁচটি শতাব্দীর প্রভাব তাদের চিন্তা ও দর্শনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এই দুর্বলতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাঠামোকে নড়বড়ে করে ফেলেছে। এর ফলে আত্মা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিপতিত। মানবতাবাদী মূল্যবোধ লাঞ্ছিত। জীবনে বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও কতগুলো অর্থহীন মূল্যবোধ প্রকৃত ও কল্যাণকর মূল্যবোধগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর ফলে মানবজীবন পশ্চাদমুখীনতা অথবা স্থবিরতার শিকারে পরিণত হয়েছে এবং তার ক্রমোন্নতি বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বস্তুগত জীবনে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেও মানব জীবন তার স্বাভাবিক বর্ধন ও ক্রমবিকাশ-বঞ্চিত। বর্তমান সভ্যতা মানব-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করছে। একে এড়িয়ে চলছে। এ জন্যে এই মারাত্মক পরিণতি আত্মপ্রকাশ করেছে।

বস্তুবাদী সংস্কৃতির বাহ্যিক চাকচিক্য যাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে না দিতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। এই চাকচিক্যের প্রভাবে বিহ্বল হয়ে আমরা যেন মানব জীবনের নিদারুণ যন্ত্রণা উপেক্ষা না করি। মিসাইল এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সমারোহের আড়ালে উঁকি মেরে তাকালে আমরা দেখতে পাবো মানব জাতি কত দ্রুত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলছে।

মানুষ আল্লাহর অতি প্রিয় সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত। সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীর সবকিছু তারই জন্যে সৃষ্ট। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়ে মানুষের অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি পরিমাপ করতে হয়। তার আত্মিক সুখ মানেই হচ্ছে তার প্রকৃতির সাথে সভ্যতার উপাদানগুলোর সংগতি।

কাজেই আমরা যদি মানবতা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলোকে নিম্নগামী, দেখি, মানুষকে প্রেরণা, বৃদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অধোগামী দেখি, মানুষের মূল দায়িত্ব পালন যদি নিশ্চল দেখি, মানুষকে যদি যন্ত্রণা, উদ্বেগ ও সংশয়বাদে হাবুডুবু খেতে দেখি তাকে যদি মনস্তাত্বিক বিপর্যয়, উন্মাদনা ও অপরাধ-প্রবণতার শিকার দেখি, তাকে যদি উদ্দেশ্যহীন জীবন-যাপন করতে দেখি, মদ-আফিম খেয়ে একঘেঁয়েমী তাড়াবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত দেখি এবং তাকে যদি স্বীয় সন্তানদের হত্যা অথবা বিক্রি করে রিফ্রিজারেটার অথবা ওয়াশিং ম্যাসিন ক্রয় করতে দেখি তখন আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? মানবতার এই করুণ অবস্থা দেখে আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হয় যে এই বিলাস-প্রিয় সভ্যতা মানুষের আত্মিক প্রয়োজন উপক্ষো করে বস্তুগত ও যান্ত্রিক সমৃদ্ধি অর্জন করে মানবতার অবক্ষয় ঠেকাতে পারেনি। মানবতাকে প্রকৃত সুখ দিতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত অগ্রগতি এই সভ্যতার ব্যর্থতা ঢাকতে পারেনি। এই সভ্যতা তার সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে এক মহাবিপর্যয়। এই সত্যটি অপরিবর্তনীয় থাকছে যে

মানবগোষ্ঠী আরেকটি জীবন-ব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছে, যে ব্যবস্থায় ভুল-ভ্রান্তি থাকবে না, যা মানুষের জীবনকে কলুষিত করবে না এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি, পরিণতি এবং জ্ঞানকেও পণ্ড করে দেবে না। মানুষের জন্যে আজ এমন এক ব্যবস্থা প্রয়োজন যা মানুষকে তার অস্তিত্বের সঠিক উপলব্ধি দান করবে এবং মানুষের উপযোগী ও তার প্রকৃতির সাথে সমিল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তার চিন্তা, বিজ্ঞান ও পরীক্ষণ-পরিণতির সদ্ব্যবহার করবে।

শ্বেতাঙ্গদের দিন ফুরিয়েছে। তারা আর সভ্যতার অঙ্গনে বিশেষ কোন ভূমিকা পালনের অবস্থায় নেই। রাশিয়ান, আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসী, সুইস, সুইডিস– সব শ্বেতাঙ্গের জন্যে একই কথা। পাশ্চাত্য মতবাদসমূহ এবং ইউরোপীয় মানসিক ব্যাধি স্কিজোফ্রেনিয়ার পরিণতিরূপেই এই ভূমিকা সমাপ্ত হয়েছে।

যেসব মতবাদ, ব্যবস্থা, সংগঠন ও পরিকল্পনার ওপর মানুষের জীবন গড়ে ওঠে সেগুলোকে অবশ্যই যুক্তিনির্ভর হতে হবে। এগুলোতে অবশ্যই মানুষের সঠিক মর্যাদা ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ণীত থাকতে হবে। মতবাদের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা আর বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক ধারার মধ্যে থাকতে হবে মিল। নির্ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর অন্যতম। একে শ্বেতাঙ্গগণ উপেক্ষা করেছে। বরং এর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছে। এদিক থেকে পশ্চিম অথবা পূর্বের মানব রচিত সব ব্যবস্থাই একই ধরনের।

কিন্তু মানুষ অতীতে যা ছিলো আজো তাই আছে। তার চিন্তার উন্মেষ, হৃদয়ের প্রশান্তি, বিশ্বজগত ও জীবনের ব্যাখ্যা এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে সে সবসময় একটা প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। সে এমন এক প্রত্যয় বা বিশ্বাস অনুসরণ করতে চায় যা তার স্বীয় সত্তা, তার কাল ও তার জেনারেশন হতে বৃহত্তর এবং তার বাস্তবতা হতে মহত্তর লক্ষ্যের স্বীকৃতি দেয়। সে চায় যে তার প্রত্যয়বাদ তাকে এমন এক সত্তার সাথে সম্পর্কিত করুক যিনি তাকে পদনির্দেশ ও নিরাপত্তা দান করতে সক্ষম। সে ওই সত্তাকে ভয় করতে চায়, ভালবাসতে চায়। সেই সত্তা থেকে সে তুষ্টি কামনা করবে এবং তাঁর কাছে সব উত্তম কাজ করার সাহায্য লাভের প্রার্থনা জানাবে। তাঁর কাছে পাপ নিয়ে উপস্থিত হতে সে লজ্জাবোধ করবে। এমন এক সত্তার প্রতি বিশ্বাস মানুষের অতীব প্রয়োজন। এখেকেই মানুষ অর্জন করে চিন্তার বিশেষ ধারা; আচরণের নীতিমালা এবং উপাসনার নিয়ম-কানুন। এটা অর্জিত হলে তার সামগ্রিক জীবন সংগতিপূর্ণ হয়। জীবন হতে দূর হয় সব বৈসাদৃশ্য।

দৈহিক ক্ষুধা, বস্তুগত সমৃদ্ধির নেশা ও ইন্দ্রিয় সুখের মাঝে একজন মানুষ কিছুকাল ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু মানব সত্তা এই বস্তুগত প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণের মাঝে নিঃশেষ হয়ে যায় না। বস্তুগত প্রয়োজন মিটে যাবার পরও আরো কিছু প্রয়োজন বাকী থেকে যায়। বরং বস্তুগত প্রয়োজন মিটে যাবার পরে পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সম্পদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয় এমন একটা ক্ষুধা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই ক্ষুধা ভিন্ন রকমের। এটা হচ্ছে মানুষের চেয়েও বৃহত্তর এক শক্তি, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্ব হতে বৃহত্তর এক বিশ্ব এবং পার্থিব জগত হতে ভিন্নতর এক জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষুধা। মানুষের মন চায় বাস্তব জীবনের আইন এবং তার বিবেকের আইনের মাঝে একটা সম্প্রীতি। তার মন কামনা করে মানুষের ব্যক্তিগত বাস্তবতা এবং বিশ্বলোকের বাস্তবতার মধ্যকার একটা মিল। মনের গভীরে প্রতিটি মানুষ এক আল্লাহর অনুসন্ধান করে ফিরে যিনি একাধারে তাকে নৈতিক এবং সামাজিক আইন নির্দেশ করবেন।

মানব সত্তার গভীরে লুক্কায়িত বিভিন্ন রকমের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাবার ব্যবস্থা না দিয়ে কোন জীবনব্যবস্থাই মানুষের প্রকৃত ও সঠিক সুখ নিশ্চিত করতে পারে না। শ্বেতাংগদের সভ্যতায় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টটির অভাব রয়েছে। আর প্রধানতঃ এই কারণে মানব সভ্যতায় শ্বেতাংগদের বিশেষ ভূমিকা পালনের দিন শেষ হয়ে গেছে।

সতর্কবাণী

আজ পৃথিবীর দিকে দিকে সতর্কবাণী শুনা যাচ্ছে। শ্বেতাংগদের ধর্ম বিবর্জিত সভ্যতার পরিণতি সম্বন্ধে মানুষকে সাবধান করা হচ্ছে। এসব সতর্কীকরণ বিভিন্ন রকমের। অবক্ষয়ের গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কেউ কেউ মানুষকে হুঁশিয়ার করেছেন। কেউ আবার মার্কসবাদের ভয়াবহ গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়া সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন। আত্মরক্ষার বিভিন্ন পন্থা বাতলাচ্ছেন বিভিন্ন জন। কিন্তু এসব পন্থা মোটেই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কারণ এগুলো সমস্যার মূলীভূত কারণ চিহ্নিত করছে না এবং মাটির গভীর থেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শিকড়টি মূলোৎপাটনের ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছে না।

এসব সাবধান বাণী এবং সমস্যার প্রতিকারার্থে উপস্থাপিত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে ইউরোপীয় মানসিকতার অদূরদর্শিতা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পরিষ্কারভাবেই বুঝা যে পাশ্চাত্যের কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিন্তাবিদেরা আধা-বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির খাঁচায় বন্দী। এই খাঁচা থেকে মুক্ত হবার জন্যে তাঁরা খুব চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। তাঁরা ভ্রান্ত 'বাস্তবতাবাদের' হাতে বন্দী। এটা তাঁদেরকে মুক্ত ও বিজ্ঞজনোচিতভাবে ভবিষ্যতের দিগন্তগুলো অনুসন্ধান করতে বাধা দিচ্ছে।

এটাই হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব পালনে যথার্থ সময়।

ওই খাঁচাটা ভেংগে ফেলে বাহিরে এসে স্বাধীন দৃষ্টিভংগী নিয়ে পুরো পরিস্থিতিটা বিচার-বিশ্লেষণ না করতে পারলে মানবজাতি প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিবেচনা করলেই সমস্যার ব্যাপক ধারণা লাভ এবং সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আরো সম্মুখে অগ্রসর হবার আগে এখানে আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টি-প্রসূত দু'টো সতর্কবাণী ও সমস্যার প্রতিকারের পরামর্শ আলোচনা করতে চাই। এর একটি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ ক্যারেল-এর এবং অপরটি এই যুগের অন্যতম বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জন ফস্টার ডালেস-এর। মিঃ ডালেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন জাঁদরেল পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন।

"ম্যান দি আননৌন" নামক একটা বড়ো রকমের বইতে ডঃ ক্যারেল বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার– যা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টটাই বাদ দিয়েছে– ওপর তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাকৃতিক আইনসমূহ লংঘনের মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি মানুষের মন ও দৈহিক জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেন :

"এই কালের মানুষের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী প্রত্যেকের চোখের সামনে তুলে ধরাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের সভ্যতার দুর্বলতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। আজ অনেকেই তাঁদের ওপর চাপানো মতগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন। অনেকেই আজ সাহস করে মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। শৈল্পিক সভ্যতার অপসারণ এবং মানবিক অগ্রগতির জন্যে নতুন কোন ধ্যান-ধারণার উপস্থাপন কামনা করছেন।"

"শৈল্পিক জীবন সংগঠিত করতে গিয়ে শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আজকের শিল্প-সংগঠন 'সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ উৎপাদন' এই নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ব্যক্তি বা গ্রুপের সর্বোচ্চ আয় এগুলোর আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শৈল্পিক জীবন ম্যাসিনের পেছনের মানুষগুলোর মৌলিক প্রকৃতি এবং তাদের ও তাদের সন্তানদের ওপর কারখানার নকল জীবনধারার প্রভাব বিবেচনা না করেই গড়ে তোলা হয়েছে।"

"মানুষই সবকিছু পরিমাপের কেন্দ্র হওয়া উচিত। অথচ মানুষ তার চারদিকে যে জগত সৃষ্টি করেছে, সেই জগতে সে নিজেই আজ নবাগত অচেনা ব্যক্তির মতো হয়ে আছে। এই জগতটাকে নিজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধেই তার আসল জ্ঞান নেই। তাই জীবন্ত প্রাণীর ওপর জড়বস্তু বিজ্ঞানের বদৌলতে যে প্রাধান্য লাভ করেছে মানব জাতির জন্যে তা-ই আজ বড়ো বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বুদ্ধি ও অধিকার যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা না আমাদের আকৃতি, না আমাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আমরা আজ অসুখী। নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে আমরা অধঃপাতের দিকে ধাবিত। যে গ্রুপ এবং জাতিসমূহের মধ্যে শৈল্পিক সভ্যতা ব্যাপকভাবে বিকশিত সেগুলোই আজ ক্রমশঃ দুর্বলতার কবলে নিপতিত হচ্ছে। সেগুলো অতি দ্রুত বর্বরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের খবর নেই। তাদের চতুর্দিকে বিজ্ঞান যে বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার মুকাবিলায় তাদের নিরাপত্তা নেই। সত্যিকার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সভ্যতা এবং এর আগেকার কয়েকটি সভ্যতা এমন এক অবস্থার জন্ম দিয়েছে যার ফলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। আজকের শহরগুলোর অধিবাসীদের উদ্বেগ ও দুঃখ-যন্ত্রণা তাদের সৃষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ফলশ্রুতি।"

"যান্ত্রিক আবিষ্ক্রিয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার আবিষ্কারগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেও কোন সুবিধা হবে না। এটা সত্য যে নিছক বিজ্ঞান আমাদের জন্যে কোন ক্ষতি নিয়ে আসে না। যখন বিজ্ঞানের সৌন্দর্য আমাদের মনকে পরাভূত করে এবং আমাদের চিন্তাকে বন্দী করে তখনই বিজ্ঞান বিপজ্জনক রূহ পরিগ্রহ করে। মানুষের উচিত এবার নিজের দিকে এবং তার নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতার দিকে নজর দেয়া। আমাদের দুর্বলতা যদি সভ্যতাকে আমাদের সর্বোত্তম ব্যবহার হতে আড়াল করে রাখে তাহলে এই সভ্যতার বিলাসিতা, সৌন্দর্য, কলেবর ও জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কি? যে জীবন পদ্ধতি মহান জাতিসমূহের নৈতিক অধঃপতন ও মহান গুণাবলীর ক্ষয়সাধন করে চলেছে তাকে ব্যাপকতর করে কোন লাভ নেই।"

"আজকের মানুষ সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পরিবার, পরিবেশ এবং চিন্তা ও জীবনধারার বিশেষ অভ্যাসগুলোরই ফসল। আমরা দেখিয়েছি কি করে এসব অভ্যাস তার দেহ ও চেতনাকে প্রভাবিত করে। আমরা জানি যান্ত্রিকতা যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তার সাথে মানুষ সহজে নিজকে খাপ খাওয়াতে পারে না। এই পরিবেশ তার অধঃপতন ঘটায়। এই অবস্থার জন্যে বিজ্ঞান এবং ম্যাসিন দায়ী নয়। এজন্যে দায়ী আমরা। বৈধ আর অবৈধের পার্থক্য নির্ণয় করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ হয়েছি সংগত আর অসংগতের পার্থক্য নির্ণয় করতে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত কেন তাঁরা শুধু দৈহিক রোগের প্রতিকার নিয়ে ব্যস্ত এবং কেন মানুষের মানসিক ও স্নায়ুবিক বিপর্যয় রোধের উদ্যোগ গ্রহণ করে না। কেন তারা আত্মিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয় না? তারা কেন সংক্রামক রোগগ্রস্ত দেহকে আলাদা করে রাখে অথচ বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক রোগের প্রসারকারীদেরকে আলাদা করে রাখে না? দৈহিক রোগ সৃষ্টিকারী অভ্যাসগুলোকে বিপজ্জনক বিবেচনা করে কেন তারা দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা ও উন্মত্ততা সৃষ্টিকারী অভ্যাসগুলোকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে না?"

"অর্থনীতিবিদদের বুঝা উচিত যে মানুষ চিন্তা করে, অনুভব করে এবং যন্ত্রণা ভোগ করে। তাদেরকে কাজ, খাদ্য ও অবকাশ দেয়ার সাথে সাথে ভিন্ন রকমের জিনিসও দিতে হবে। কেননা তাদের জীবনে আত্মিক দিকও রয়েছে। তাদের এটাও বুঝা উচিত যে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর পেছনে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কারণও থাকতে পারে। বড়ো বড়ো শহরের জীবনযাত্রা, অফিস ও ফ্যাক্টরীর স্বৈরাচার, অর্থনৈতিক স্বার্থে নৈতিক পরাজয় বরণ এবং অর্থের কাছে মনের বলিদানকে সভ্যতার আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করতে আমাদের আর বাধ্য থাকা

উচিত নয়। আমাদের উচিত মানবিক উৎকর্ষের প্রতিবন্ধক যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলোকে এড়িয়ে চলা। অর্থনীতিই সবকিছুর কারণ– এই মনোভাব পরিত্যাগ করা। এটা নিশ্চিত যে বস্তুবাদী চিন্তাধারা হতে মানুষের মুক্তি অর্জিত হলে আমাদের অস্তিত্বের অনেক দিকই ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আর এটা উপলব্ধি করে আজকের সমাজ আমাদের চিন্তার এই অগ্রগামিতাকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিতে পারে।"

"সে যাই হোক, আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে বস্তুবাদের ব্যর্থতা যেন আত্মিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে না পারে। যেহেতু যান্ত্রিকতা এবং বস্তুপূজা সার্থকতা আনতে ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু বিপরীত দিক তথা মনের পূজার লোভ মানুষকে পেয়ে বসতে পারে। মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য দেহতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার প্রাধান্যের চেয়ে কম বিপজ্জনক হবে না। ফ্রয়েড একজন যান্ত্রিক বিজ্ঞানীর চেয়েও মানুষের বেশী ক্ষতি সাধন করেছেন। মানুষকে দেহগত, জৈব-রাসায়নিক যন্ত্ররূপে বিচার করা আর কেবল একটা মনস্তাত্ত্বিক জীবে পরিণত করার প্রচেষ্টা সমানভাবেই ক্ষতিকর। রক্তের পানিবৎ অংশ, তার রাসায়নিক সমতা, প্রোটোপ্ল্যাজমিক সম্প্রসারণ, এনটিজেনের রাসায়নিক গঠন ইত্যাদির অধ্যয়ন বিশ্লেষণ যেমনি অত্যাবশ্যকীয় তেমনি অত্যাবশ্যকীয় স্বপ্ন লিবিডো, মিডিয়ামিস্টিক স্টেট্স, উপাসনার দেহ-তাত্ত্বিক প্রভাব, স্মৃতি ইত্যাদির অধ্যয়ন-বিশ্লেষণ। বস্তুবাদের বিকল্প রূপে মনোবাদ গ্রহণ করলে রেনেসাঁকালীন ভুল-ভ্রান্তির পরিশুদ্ধি ঘটবে না। মনকে বাদ দেয়ার ক্ষতির চেয়েও মারাত্মক হবে বস্তুকে বাদ দেয়ার পরিণতি। তাই নিষ্কৃতি তালাশ করতে হবে সব তাত্ত্বিকতার ঊর্ধে উঠে।"

এই হচ্ছে ডঃ ক্যারেলের হুঁশিয়ারীর সারকথা। প্রতিকার হিসেবে তাঁর বক্তব্য কি? নিষ্কৃতি বা মুক্তির জন্যে তাঁর প্রদর্শিত সমাধানটা কি? কোনটি সেই ব্যবস্থা যা আজকে বস্তুপূজার পরিবর্তে বস্তুর ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করে মধ্যম পথ দেখাবে? সেই ব্যবস্থা কোনটি যা মানুষকে বস্তুর প্রভুতে পরিণত করবে এবং যা একই সময়ে মধ্যযুগীয় বৈরাগ্যবাদ ও এই যুগের ফ্রয়েডবাদের বিভ্রান্তিমুক্ত থেকে সঠিক পথের দিশা দেবে?

মানব অস্তিত্বের সম্মুখস্থ মহা বিপর্যয় উপলব্ধির পর ডঃ ক্যারেল কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন? শৈল্পিক সভ্যতা ও সব তাত্ত্বিকতার অবসান ঘটিয়ে তিনি কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে চান? আসুন আমরা উত্তরটা শুনি।

"আমরা বস্তু বিজ্ঞানের মুকাবিলায় মানব বিজ্ঞানের পশ্চাদমুখীনতার শিকার।"

"এই ক্ষতির সম্ভাব্য প্রতিকার হচ্ছে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আরো গভীর জ্ঞান অর্জন। এই জ্ঞানই আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে কি পন্থায় আধুনিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি আমাদের চেতনা ও দেহকে প্রভাবিত করছে। তখন আমরা জানতে পারবো কি করে এই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো যাবে এবং কি করে একে পরিবর্তন করা যাবে যদি একান্তই কোন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে। আমাদের আসল প্রকৃতি ও সম্ভাবনা বিকাশ করার কালে এবং এর বিকাশ পদ্ধতি নির্ণয় করার সময়ে এই জ্ঞানকে আমাদের দেহতাত্ত্বিক দুর্বলতা এবং নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাধিসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে। আমাদের দেহগত ও আত্মিক কার্যাবলীর আইনগুলোকে জানার এবং সংগত ও অসংগতের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান অর্জনের এই ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যেহেতু আজকের সভ্যতা জীবনসত্তার স্বাভাবিকতা ধ্বংস করে ফেলেছে, সেহেতু "মানব-বিজ্ঞানই" হচ্ছে সবচে' বেশী প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান।"

বিশ্ব-বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী মানুষের আসন্ন বিপদের উপলব্ধির পর শুধু এটুকুই বলতে পারলেন। তিনি যা বলতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে মানুষের উচিত মানবতাবাদকে বাঁচানো। তা না হলে মানুষ অসভ্যতা, বর্বরতা ও পতনের দিকে অবিরাম গতিতে এগুতে থাকবে। তাঁর এই বক্তব্য মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন ও মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানে এই সভ্যতার ব্যর্থতারই একটা উদাহরণ। আজকের সংস্কৃতি পাশ্চাত্য মনকে বিজ্ঞান ও বাস্তবতাবাদের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এই গন্ডীর বাইরে এসে ভিন্ন কিছু ভাবতেই তা অপারগ। অথচ বস্তুনিষ্ঠ সমাধান এমন একজনের কাছে থেকেই আসা সম্ভব যিনি ভেতর থেকে নয় বাইরে থেকে পুরো পরিস্থিতিটা অবলোকন করছেন।

মানব-বিজ্ঞান বস্তু-বিজ্ঞানের পেছনে পড়ে থাকাটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটা একটা স্বাভাবিক পরিণতি। একটা নকল মতবাদের ভিত্তিতে মানুষের মূল্য ও ভূমিকা নির্ণয় করার অনিবার্য পরিণতিরূপে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। যে আদর্শিক মতবাদ মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি দাবী করে এবং মানুষকে মর্যাদা দান করে সেই মতবাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলার ফলশ্রুতি এটা।

ডঃ ক্যারেল বর্ণিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দুর্বলতা, মানবতাবাদের অনুপস্থিতি, এবং মানবিক গুণাবলী ও প্রয়োজনসমূহের প্রতি উদাসীনতা ধর্মের প্রতি বৈরী শৈল্পিক সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি। এই সভ্যতার ধ্বজাধারীরা

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রবেশাধিকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

এসব ব্যক্তিদের মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান– ডঃ ক্যারেলের ভাষায় 'অজ্ঞাত'– এবং এই সামান্য জ্ঞানের ওপর নির্ভরতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। আল্লাহ প্রদত্ত মানব-প্রকৃতির জ্ঞানের প্রতি বৈরিতার কারণে এটা ঘটেছে। আর আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞানের প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপে বিজ্ঞানের প্রতি গীর্জার ভ্রান্ত, অযৌক্তিক ও অবিজ্ঞজনোচিত আচরণ থেকে।

তাই আমরা বলতে পারি যে ডঃ ক্যারেলের উপলব্ধির চেয়েও আরো বেশী জটিল এই সমস্যা। বর্তমান সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব তাঁর ধ্যানী মনের উপর যে বিধি-নিষেধ আরোপ করে রেখেছে তার কারণে এর চেয়ে বেশী দূর তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। দেখতে পারেননি পুরো প্রেক্ষাপট।

ডঃ ক্যারেল মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ওপর বস্তুবাদী শৈল্পিক সভ্যতার অনধিকার চর্চার বিপদ অনুভব করেছিলেন। আর আমেরিকার এককালের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস কমিউনিজমের বিপদ অনুভব করতে পেরেছিলেন। কমিউনিজম বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মতবাদ। মিঃ ডালেস একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোর জন্যে এক মহাবিপদরূপেই দেখেছিলেন। মিঃ ডালেস তাঁর War or Peace নামক গ্রন্থে এই বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এর প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত সমাধানেও বলিষ্ঠতা এবং সারবত্তা ছিলো না। তিনি ধর্মযাজক সম্প্রদায়কে এমন এক দায়িত্ব পালন করতে আহ্বান জানিয়েছেন যা পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

"Our Spiritual Needs" নামক অধ্যায়ে মিঃ ডালেস বলেন, "আমাদের জাতীয় জীবনে কিছু গোলমাল ঘটেছে, তা না হলে আমরা বর্তমান উদ্বেগজনক অবস্থার সম্মুখীন হতাম না। আত্মরক্ষামূলক এবং ভীতি জড়িত ভূমিকা পালন আমাদের বৈশিষ্ট নয়। এটা আমাদের জীবনে নতুন ব্যাপার। আমাদের আজকের সমস্যাটা বৈষয়িক নয়। আমরা বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড সৃষ্টি করে চলছি। আমরা আজ সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রত্যয়ের অভাবে পড়েছি। এই অভাবের কারণে সবকিছুই পণ্ড হতে চলেছে।

এই ঘাটতি কোন জাঁদরেল রাজনীতিবিদ অথবা কোন উর্বর মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী অথবা শক্তিশালী বোমা তৈরী দ্বারা পূরণ হতে পারে না। একটা জাতি যদি একবার

অনুভব করে যে সে বস্তুর ওপর নির্ভরশীল, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। দেশাভ্যন্তরে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো এদের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় আত্মিক আনুগত্য আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মানুষের মনে একটা অনিশ্চিতভাব এবং তাদের আত্মিক সত্তা ক্ষয়িষ্ণু। এই কারণেই আমাদের জাতি শত্রুদের অনুকূল হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা তৎপরতার তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে এর প্রমাণ মিলে। এই অবস্থাতে কোন শক্তিশালী এফ. বি. আই. আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।"

মিঃ ডালেস অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়মের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে এক ব্যক্তির উচিত 'আল্লাহর শাসন এবং তার ন্যায়-বিচার সর্বাগ্রে তালাশ করা। বাকী সব কিছুও তার কাছে এসে যাবে।'

"কিন্তু যখন তা ঘটবে, তখন আসবে অগ্নি পরীক্ষা। কারণ ঈসা (আ) হুঁশিয়ার করেছেন যে বস্তুগত উপকরণ আত্মাকে ক্ষয়কারী ঘুণে পরিণত হতে পারে। এখানে একটা সুপরিচিত ধারা বিদ্যমান। যেসব ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে উচ্চতর কোন এক শক্তির প্রতি তাদের কর্তব্য আছে, তারা সেই শক্তির ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালায়। তাদের এই প্রত্যয়ের কারণে তারা বিশেষ শক্তি, সভ্যতা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। আজকের জন্যে তারা গড়ে না, তারা গড়ে আগামী দিনের জন্য। তারা শুধু নিজের জন্যে গড়ে না, গড়ে গোটা মানব জাতির জন্যে। এমনিভাবে গড়ে ওঠা সমাজ বহুলোকের জন্যে প্রাচুর্য ও বিলাস উপকরণ উৎপাদন করে থাকে। এই বাই-প্রোডাক্টস যখন আসে, এগুলো এতো ভালো মনে হয় যে এগুলোকে শেষ লক্ষ্য বলে অনেক সময় ভুল করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী সৃজন-তৎপরতা থেকে তখনই মানুষকে অন্যদিকে নিয়ে আসা হয়। তখন সংগ্রামটা শুধু বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন ও সংরক্ষণের জন্যেই চালিত হয়।"

"এই পরিবর্তনের সাথেই আসে ক্রমবর্ধমান বিপদ। একটিমাত্র উপায়ে আমেরিকার অধিবাসীরা নিরাপত্তা পেতে পারে। এক মহান প্রচেষ্টার বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে তারা নিরাপত্তা পেতে পারে। আমরা যখন কেবল নিরাপত্তাকেই পেতে চেয়েছি, নিরাপত্তা তখন আমাদেরকে এড়িয়ে চলেছে। আমরা যত ধনীই হইনা কেন, নিরাপত্তা কোনদিন আমরা কিনতে পাবো না। পাঁচ বিলিয়ন বা পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারও যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা ও শান্তি ক্রয়যোগ্য দ্রব্য নয়। পতন যুগে রোমান সম্রাটগণ অর্থের বিনিময়ে শান্তি কিনতে চেয়েছেন। নিরাপত্তা ক্রয়ের

প্রচেষ্টা নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ক্ষুধাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।"

মিঃ ডালেস আরো বলেন যে, তাঁর জাতির প্রভাব ও নিরাপত্তা যতই কমছে কমিউনিস্টদের প্রভাব ও নিরাপত্তা ততই বাড়ছে। 'গ্রেট সোভিয়েট একসপেরিমেন্টের' নামে কমিউনিজম তার নীতি বাস্তবায়িত করেছে। এর মাধ্যমে কমিউনিস্টরা বিশ্ববাসীর চিন্তা-কল্পনাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকানরাও তাই করতে পেরেছিলো 'গ্রেট আমেরিকান একসপেরিমেন্টের' নামে। মিঃ ডালেস বলেন, আমেরিকানরা জানে যে কমিউনিস্টদের দাবী প্রতারণামূলক। তারা জানে যে কমিউনিস্টরা তাদের পরীক্ষাকার্য দেখার সুযোগ কোনদিনও অন্যদেরকে দেবে না। তারা আরো জানে যে আদর্শের নামে ফাঁদে পড়েছে, একথা শিগগিরই রাশিয়ানগণ বুঝতে পারবে। তিনি কমিউনিস্ট প্রপাগ্যান্ডাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করেছেন। যেসব জাতি তার ফাঁদে পড়েছে কমিউনিস্ট স্বৈরাচার সেগুলোর জীবনীশক্তি শোষণ করে নিঃশেষ করে ফেলেছে। তবুও কমিউনিজম সমর্থন পাচ্ছে এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এমনকি পশ্চিম ইউরোপেও।

"স্ট্যালিন বলেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর শক্তি-সামর্থ্য এখানেই যে এই মতবাদ সমাজের বস্তুগত জীবনের উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তার ওপরই তার বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালিত করে।

পৃথিবীর অনেক অ-কমিউনিস্ট দেশ পাশ্চাত্যের অনেকগুলো খৃস্টান দেশসহ আজ সমাজের বস্তুগত উন্নয়নের ওপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করছে এবং ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নকে গৌণ বিবেচনা করছে।

কমিউনিস্টরা তাই উদাহরণ দিয়ে থাকে যে এমনকি পাশ্চাত্য সমাজগুলোও কমিউনিজমের বস্তুবাদী মতবাদকে মেনে নিয়েছে। পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ এই অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছেন না। এই কারণে কমিউনিজমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

"জটিলতাটা এখানে যে আমরা আমাদের প্রত্যয় এবং বাস্তব জীবনের সাথে এই প্রত্যয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে খুব স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী নই। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাবাদ চর্চা না করেও আমরা সামাজিক সুবিচার কায়েম করতে পারি, এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের কেউ

কেউ মুক্ত সমাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। জাতিগতভাবে আমরা ধর্মানুসারী, কিন্তু আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ধর্ম এবং বাস্তব কাজকে দু'ঘরে আলাদা করে রেখেছি।"

"আমরা ভেবে দেখিনা যে আমাদের প্রত্যয় আর বর্তমান অবস্থা পরস্পর সম্পর্কিত। একবার যদি প্রত্যয় ও কর্মের মধ্যকার সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবহমান একটা আত্মিক শক্তি উৎপাদন করতে আমরা হবো ব্যর্থ।"

মিঃ ডালেসের উপদেশ এবং ক্যারেলের হুঁশিয়ারীর প্রতি কারো পক্ষে তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়া সম্ভব নয়। মিঃ ডালেস গীর্জা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানিক এবং আল্লাহ ও দেশকে ভালবাসে এমন ব্যক্তিবর্গের সামনে যে চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছেন তার দ্বারাও সমস্যার সমাধান হয় না।

বিষয়টা আরো গভীর। জীবনকে নতুন ছন্দে আন্দোলিত করতে পারে এমন শক্তি তো খৃস্টবাদ অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে। সেন্টপল, সম্রাট কনস্ট্যানটাইন, ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল ও পোপদের দ্বারা খৃস্টবাদ বিশেষভাবে বিকৃত হয়েছে। খৃস্টবাদ বলে যা কিছু অবশিষ্ট আছে আমেরিকায় তাও আবার প্রায় অচেনা। আমেরিকার সমাজ সুদ ও একচেটিয়া মালিকানাভিত্তিক চরম পুঁজিবাদের শিকার। এর মূলে আছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ। পংগু খৃস্টবাদকে চাংগা করতে চাচ্ছেন ডালেস সাহেব। কিন্তু তিনি নিজেও এর প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী নন।

খৃস্টবাদ গৃহীত হলে তো প্রথমেই সুদ বর্জিত হওয়ার কথা। অথচ সুদ বর্তমান পুঁজিবাদী সভ্যতার ভিত্তি। এই সুদ ব্যবস্থা মনুষ্যত্ব এবং তার নৈতিক সংস্কৃতি ধ্বংস করে ফেলে। এই সুদ খৃস্টবাদে নিষিদ্ধ। যেমনিভাবে নিষিদ্ধ অন্যান্য ধর্মে। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিও বলে যে সুদ ব্যবস্থা অতি গর্হিত।

মনে হয় মিঃ ডালেস চাচ্ছেন খৃস্টবাদ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না করেই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে লেগে যাক। এমনকি মিঃ ডালেস যদি সামগ্রিক জীবনেও ধর্মীয় নৈতিকতা আরোপ করতে ইচ্ছুক হন তবুও তা সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃত খৃস্টীয় শিক্ষা এবং বাস্তব জীবনের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য বিরাজ করছে। এই পার্থক্য পাঁচশ' বছরের তিক্ত বিতর্ক ও বিবাদের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

মিঃ ডালেস গীর্জা এবং রাজনৈতিক নেতাদেরকে প্রকৃত পক্ষে এক অসাধ্য সাধন করতে বলছেন। তিনি চাচ্ছেন, খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে একটা নব চেতনার উন্মেষ। কিন্তু খৃস্টবাদ আছে কোথায়? আছে তো শুধু গীর্জা ও পুরোহিত দলের সাথে বিবেক ও বিজ্ঞানের সংঘাতের স্মৃতি। নেতিবাচক মানসিকতা ছাড়া আর তো কিছু বাকি নেই। এই মানসিকতা ধর্ম ও সংস্কৃতির শত্রুতা বৃদ্ধির কাজই করে থাকে। মিঃ ডালেস একটা নড়বড়ে ধর্মের কাছে প্রত্যয়ের সাথে কাজের, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের সাথে সমষ্টিবাদের, আত্মার সাথে বস্তুর এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে আত্মিক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় প্রত্যাশা করেছেন। খৃস্টবাদের কাছে এটা খুব বেশী চাওয়া। প্রত্যয়ের ভিত্তিতে একটা মজবুত সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার শক্তি এখন খৃস্টবাদের নেই। প্রয়োজন এমন একটা ব্যবস্থার যা প্রত্যয় ও কর্মের পার্থক্য সৃষ্টি করে না এবং যা বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাবাদ ছাড়া সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়– এই ধারণার অবসান ঘটাবে। এমন এক ব্যবস্থার প্রয়োজন যা বস্তুবাদ প্রধান অবলম্বন, একথা বর্জন করবে। বর্জন করবে অধিকতর উৎপাদনের জন্যে দাসত্ব ও স্বৈরতন্ত্র প্রয়োজন, এই অভিমতকে। এমন এক ব্যবস্থা চাই যা প্রাচুর্যের জন্যে ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার স্বীকার করবে না, বিজ্ঞানের গবেষণা ও উন্নতিকে ভণ্ডুল করে দেবে না, ধর্মকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা কোণঠাসা হতে দেবে না এবং যা ইবাদাত ও কর্মকে একই সূত্রে গ্রথিত করবে।

ক্ষয়প্রাপ্ত একটা ধারণার অবশিষ্টাংশ, ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ, পরিবর্তিত ধর্ম, এবং মানব জীবন ও বস্তুগত জগতের মাঝে বিদ্যমান দুর্লংঘনীয় দূরত্ব যে পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে সেখানে এই ধরনের একটা ব্যবস্থার আবিষ্কার আশা করা নিরর্থক।

নতুন বিশ্ব সমাজ আরেক উৎস থেকে আসতে হবে। যে ধর্ম পূর্ণাংগ ও নিখুঁত ব্যবস্থা দিতে সক্ষম সেই ধর্ম তো ডালেস সাহেবের বন্ধুদের অনুসৃত ধর্ম নয়।

মিঃ ডালেস আসলে ধর্মীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত দেশপ্রেম চাচ্ছেন যাতে তিনি পাশ্চাত্য সমাজকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। ধর্ম যদি নামকাওয়াস্তে একটা কিছু হয়, তাহলে তা বস্তুবাদী ব্যবস্থার সাথে লড়াই করে কিছুই করতে পারবে না। মানুষের জীবনে অপ্রাসংগিক হয়ে থেকে মানুষের প্রতিরক্ষার জন্যে ধর্ম বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। আল্লাহর অবতীর্ণ ধর্মের পক্ষে এটা অশোভনীয় যে তা ভৃত্যের মতো মনিবের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে, মানিবের আদেশে কুর্ণিশ করে প্রস্থান করবে এবং তার নতুন আদেশ শিরোধার্য করার জন্যে দরওয়াজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আল্লাহর ধর্ম এই ভূমিকা পালন করতে পারে না। আল্লাহর ধর্ম তো আদেশদাতার ভূমিকা পালন করবে। এই ধর্ম হবে শক্তিধর, নির্দেশকারী ও সম্মানিত। এই ধর্ম শাসন করবে, শাসিত হবে না। তা অন্যকে পরিচালিত করবে, নিজে কারো দ্বারা পরিচালিত হবে না। মানুষ পুরোপুরি ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ধর্ম তাদেরকে বাঁচাতে আসে না। মানুষ যখন ধর্মের অনুশাসন দ্বারা জীবনকে পুনর্গঠিত করতে সম্মত হয়, নিজেদের সব ব্যাপারে ধর্মকে মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করে এবং এর সিদ্ধান্তগুলোকে বিনীতভাবে গ্রহণ করে, কেবল তখনই ধর্ম তাদের নিরাপত্তার জন্যে এগিয়ে আসে। আল্লাহ বলেন,

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাস আনয়নকারী হতে পারে না যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" (আননিসা)

এই অবস্থাতেই কেবল ধর্ম তার ভূমিকা পালন করে। পালন করে প্রভুর ভূমিকা, ভৃত্যের ভূমিকা নয়। আর তখন বিপর্যস্ত মানব-ব্যক্তিত্ব নেতিবাচকতার প্রচণ্ডতা থেকে মুক্তি লাভ করে। আর তখন আসে বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত পরিত্রাণকারী। আসলে মানুষের পরিত্রাণকারী হচ্ছে নিখুঁত ও নির্ভেজাল ধর্ম।

ত্রাণকর্তা

"সব স্থান থেকেই সাহায্য ও পরিত্রাণের জন্যে আওয়াজ উত্থিত হচ্ছে। সবাই বিশেষ গুণসম্পন্ন ত্রাণকর্তার অন্বেষণ করছে। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট ও গুণ ইসলাম ছাড়া আর কিছুতেই নেই।"

এই বইয়ের প্রথমে এ কথাগুলো আছে এবং "সতর্কবাণী" নামক অধ্যায়ে আমরা এর ব্যাপক আলোচনা করেছি। আমরা ডঃ ক্যারেল এবং মিঃ ডালেসের লিখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমরা দেখতে পেয়েছি এই দু'ব্যক্তি তাঁদের যথার্থ ত্রাণকর্তা চিনতে ভুল করেছেন।

০ ০ ০ ০

ডঃ ক্যারেল শিল্প ও যান্ত্রিকতার ধর্মের পরিবর্তে অপর কোন জীবন-ব্যবস্থা পেতে আগ্রহী। তিনি এমন এক ব্যবস্থার প্রত্যাশী যা মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যা মানুষকে তার সৃষ্ট পরিবেশে তাকে অচেনা আগন্তুকে পরিণত করে না, যা শৈল্পিক জীবন সংগঠিত করা কালে শ্রমিকদের দেহ ও মানসিক অবস্থার ওপর কারখানার প্রভাব উপেক্ষা করে না এবং যা সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ উৎপাদন নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। ডঃ ক্যারেল এমন এক ব্যবস্থা চান যেখানে আমাদের মর্যাদা ও আকৃতির প্রতি বৈরী কোন পরিবেশ গড়ে উঠবে না এবং আমাদের সৌন্দর্যানুভূতি ও ধর্মীয় কার্যাবলী বাধাগ্রস্ত হবে না। তিনি এমন এক জীবন পদ্ধতি চান যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিনাশ করবে না এবং ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করবে না। তিনি এমন সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী যা মানুষকে মেষের মতো যৌথ ব্যবস্থার অধীনে বাস করতে ও কাজ করতে বাধ্য করে। তিনি অন্বেষণ করছেন এমন ব্যবস্থা যা নারী-ব্যক্তিত্ব বা পুরুষ-ব্যক্তিত্ব খর্ব করে না (কেননা উভয়ের সমানাধিকার খর্ব করা এক কঠিন জটিলতা সৃষ্টিকারী কাজ), যা মানব জীবনকে মার্কস, লেনিন ও ফ্রয়েডের কল্পনা-বিলাস দ্বারা অথবা মানুষের ইচ্ছা-কামনা ও খেয়ালীপনা দ্বারা বিধ্বস্ত করে না, যা স্বাভাবিক আইনগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করে না অথবা যুক্তিযুক্ত সীমা লংঘন করতে উৎসাহ দেয় না, যা

মানব জীবনকে জৈবিক সত্যতার সাথে সাংঘর্ষিকরূপে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে না (যেমনটি ইউরোপীয় গীর্জার বৈরাগ্যবাদে দেখতে পাওয়া যায়) এবং যা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বের ক্রটিগুলোকে সংগত বলে চালানোর চেষ্টা করে না। ডঃ ক্যারেল "মানব-বিজ্ঞানে" এই বৈশিষ্ট সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা তালাশ করছেন। অথচ তিনিই বলেছেন যে মানব মন প্রকৃতিগতভাবেই মানব সত্তাকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ।

মিঃ ডালেস কি দাবী করেছেন?

মিঃ ডালেস বস্তুগত জীবনকে এমনভাবে বর্ধিত হতে দিতে চান না যার ফলে সমাজের আত্মিক-জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি এমন এক ব্যবস্থা চান যা প্রত্যয়কে শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করে না, যা প্রত্যয়ের প্রতি অস্পষ্ট মনোভাব পোষণ করে না ও জীবনের বিভিন্ন কাজের সাথে এর সম্পর্ক সম্বন্ধে অস্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করে না, যা আমেরিকার মতো কড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে না, যা নাস্তিকতাবাদ ও বস্তুবাদ চর্চা না করে সামাজিক সুবিচার কায়েম করাকে অসম্ভব মনে করে না, যা ধর্ম ও বাস্তব কর্মকে পৃথক ঘরে আলাদা করে রাখে না, যা 'বস্তুই প্রধান' এই মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করে না, যা সহায়ক বিবেচিত হলে দাসত্ব ও স্বৈরতন্ত্রকেও ন্যায়সংগত বলে দাবী করে না, যা বস্তুগত সম্পদ উপার্জন ছাড়া মানুষের সৃষ্টির পেছনে আরো কোন উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে, যা মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কঠিন বাঁধন থেকে মুক্তি দান করে, যা উন্নতি ব্যাহত না করেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও সুস্থ প্রত্যয়বাদের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং যা প্রত্যয় ও কাজের মধ্যে একটা ন্যায়সংগত সংযোগ ও মিল স্থাপন করে। দুঃখের বিষয় মিঃ ডালেস এমন একটা ব্যবস্থা পেতে চান আমেরিকার গীর্জা ও ধর্মযাজকদের কাছ থেকে। অথচ পাশ্চাত্য গীর্জার অবস্থা, গীর্জা ও সমাজের পৃথকীকরণ এবং এর তিক্ত ইতিহাস তাঁর অজানা নয়।

০ ০ ০ ০

এটা সুস্পষ্ট যে "মানব-বিজ্ঞান" এখনো ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ফলে ডঃ ক্যারেলের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গীর্জা ও পাদরীগণ মিঃ ডালেসের আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে না। পরিত্রাণকারীর মাঝে এই দু'ব্যক্তি যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট দেখতে চেয়েছেন সেগুলো ইসলাম ছাড়া অন্য কোন

ধর্মের মাঝে নেই। তাঁদের দাবী ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার মতো যোগ্যতা একমাত্র ইসলামেরই আছে। ডঃ ক্যারেল পাণ্ডিত্য ও উদারতার অধিকারী। কিন্তু তিনিও এই আসল ত্রাণকর্তার কাছে আবেদন জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, তিনি সাদা আদমীদের একজন এবং সাদা আদমীদেরকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার তীব্র তাকিদ অনুভব করেই কলম ধরেছেন। আর ইসলাম কোন দিনই সাদা আদমীদের সৃষ্ট ছিলো না। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ডঃ ক্যারেল ইসলামের প্রতি লোকদেরকে আহ্বান জানাননি। মিঃ ডালেস আরেকজন শ্বেতাংগ। তদুপরি ইসলামের প্রতি তিনি সব সময়ে বৈরী ভাবাপন্ন। কাজেই এর নাম তিনিও নেননি। মিঃ ডালেস গুপ্তচর ও প্রতিবিপ্লবী সংগঠন কায়েম করে সারা পৃথিবীতে ইসলামের সম্প্রসারণ পথে বড়ো রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। ইসলামের মুকাবিলায় তিনি অপর যে কোন মতবাদকে প্রাধান্য দিতেন।

বিপদগ্রস্ত মানবমণ্ডলীর সব ব্যাধি ও সংকট নিরসনের উপযোগী একমাত্র ধর্ম ইসলাম।

০ ০ ০ ০

ইউরোপের মানুষ যে ধরনের জীবন ব্যবস্থার সাথে পরিচিত তা থেকে ভিন্নতর ব্যবস্থা ইসলাম। নেতিবাচক মানসিকতার যুগে, এর আগে ও পরে, পাশ্চাত্য জগত যেসব ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিলো সেগুলো থেকে ইসলাম পৃথক ধরনের ব্যবস্থা। ইসলাম একটা মৌলিক ও নিখুঁত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনন্য-ভিত্তি ও সার্বজনীন পরিকল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সম-সাময়িক অবস্থার সাথে সমঝোতা করে গড়ে ওঠেনি। এই ব্যবস্থায় আছে ঈমান, আছে কর্ম ও বাস্তবতা। কাজেই মানব জীবনকে নতুন ও অনড় ভিত্তির উপরে গড়ে তোলার সবচে' বেশী উপযুক্ত ব্যবস্থা এটাই।

মানব-বিজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তু-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে মানব সমাজ সঠিক পথের দিশা হারায়নি। মানব-প্রকৃতির বিরোধী পথে জীবনকে গড়ে তোলার জন্যে ম্যাসিনকে সুযোগ দেয়ার কালে তা হারিয়ে যায়নি। যে সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজন পদদলিত করার সুযোগ পায় তখনও এই সঠিক দিশা হারিয়ে যায়নি।

এগুলো তো পরবর্তী বিচ্যুতি। মানব জাতি পথের সঠিক দিশা হারিয়েছে রেনেসাঁ ও শিল্পযুগের সূচনায় আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থা হতে দূরে সরে পড়ার মাধ্যমে। সেই সময়ে ইউরোপীয় মানুষ শুধু গীর্জা থেকেই দূরে সরে যায়নি, দূরে সরে গেছে আল্লাহ থেকেও। তার অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থা এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিরাট ব্যবধান।

কোন জোড়াতালি অথবা বাহ্যিক প্রলেপ– ডঃ ক্যারেলের মতে মানব বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ– দ্বারা সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই। জনগণের জীবন প্রবাহ শুধু জ্ঞানের বৃদ্ধি দ্বারাই নবরূপে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। যা সত্যিকারের প্রয়োজন তা হচ্ছে ঈমানের বৃদ্ধি। কেননা মানুষের মন খাঁটি প্রত্যয় দ্বারা সঞ্জীবিত থাকে।

ডঃ ক্যারেল যখন শৈল্পিক সভ্যতাকে বিপরীতভাবে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং মানব-প্রগতির জন্যে নতুন মতের প্রবর্তন কামনা করলেন তখন আমরা আশা করেছিলাম যে বিজ্ঞানের লোহার খাঁচা থেকে বের হবার জন্যে তিনি একটা বড়ো রকমের লাফ দেবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। লোহার খাঁচায় আবদ্ধ থেকেই তিনি সতর্কবাণী শুনালেন এবং মানব জাতির ভাগ্য বিপন্ন বলে ঘোষণা করলেন।

ক্ষতিকর শক্তিসমূহের প্রভাব থেকে মানবতাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। মানুষকে আল্লাহ যে সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার দিকে তাকে ফিরিয়ে নেয়া দরকার। এ সভ্যতা নিজেই বিপদের প্রসূতি এবং প্রকৃতির প্রতি বৈরী, তার নীতি ও থিউরী দিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। ভিন্ন একটি চিন্তার প্রয়োজন যা আমাদের জীবনের মৌল বৈশিষ্টকে আকাঙ্ক্ষিত রূপ দেবে, জীবনকে প্রকৃতির আইনের সাথে সমিলরূপে গড়ে তুলবে এবং মানুষের বাস্তবতা ও বিশ্ব-অস্তিত্বের মাঝে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করবে।

মানব জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। কাজেই নতুন জীবনধারার মৌলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষ সম্বন্ধেই যদি আমাদের জ্ঞান সীমিত হয়, তাহলে মানুষের জীবনের সংস্কার বা পুনর্গঠনের নীল-নকশা রচনার যোগ্যতা আমাদের কোথায়? এতো বড়ো অজ্ঞতা নিয়ে আমরা মানুষের জন্যে একটা ব্যবস্থা রচনার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছি– যে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর সবচে' বেশী প্রিয় ও মহান সৃষ্টি– যার পরিণতিতে মানুষ কি ভোগ করবে তা আমাদের জানা নেই।

বস্তু-জগতে মানুষের অনেক আবিষ্কার ও সাফল্য দেখে আমরা আসলে অহংকারী

হয়ে পড়েছি, মানুষকে আমরা যখন এরোপ্লেন ও মিসাইল তৈরী করতে দেখেছি, পরমাণু ভেংগে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে দেখেছি এবং প্রাকৃতিক আইনগুলোকে আবিষ্কার করে নিজের কাজে লাগাতে দেখেছি, তখন আমরা ধারণা করছি যে মানুষ মানব জীবনের মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রত্যয়বাদের ধারণা দান এবং নৈতিক আচরণের বিধি-বিধান প্রণয়নেরও যোগ্যতা রাখে। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি যে মানব-মন শুধু বস্তুর ওপরই সক্রিয়। প্রাকৃতিক আইনগুলোকে বুঝার এবং বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু মনকে যখন আমরা 'মানব-জগতে' নিয়ে আসি, সে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ মানব বাস্তবতার বিশালত্বকে বুঝা তার পক্ষে সুকঠিন। ডঃ ক্যারেলের মতো বিজ্ঞানী এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে তিনি সংগে সংগে এই ধারণাও প্রকাশ করেছেন যে এই বাস্তবতাকে 'মানব-বিজ্ঞান' দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে।

আরেকটা ভুল ধরা যাক। কিছু লোক মনে করে যে প্রত্যয়বাদের প্রাধান্য মানে হচ্ছে বস্তু-বিজ্ঞান ও তার ফলশ্রুতির বিসর্জন। এটা নিতান্তই আজগুবী ধারণা। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে এই বিভ্রান্তির মূল নিহিত। মূল নিহিত সেই ইতিহাসে যা মিঃ ডালেসকে Our Spiritual Needs নামক অধ্যায়টি লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এই অধ্যায় থেকেই আমরা তাঁর সতর্কবাণী ও পরামর্শগুলো এই বইতে সংযোজন করেছি।

অবতীর্ণ ব্যবস্থা আসলে আলাদা ধরনের। ধর্ম জ্ঞান ও সভ্যতার বিকল্প নয়, এগুলোর শত্রুও নয়। বস্তুতঃ জীবনের সব দিক ও বিভাগ নিয়ন্ত্রণকারী খাঁটি ধর্মের পরিসীমাতে জ্ঞান ও সভ্যতা সুন্দরভাবে বিকশিত হয়।

ইসলাম বস্তুজগত, এর আইনসমূহ, শক্তি নিচয় ও সম্ভাবনাময়তার মুখোমুখি ব্যক্তির চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। ইসলাম মনকে বেশী বেশী চিন্তা করার ও উদ্ভাবন করার জন্যে গ্রীন সিগনাল দিয়েছে এবং যে বিশাল বিশ্বে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি সেই বিশ্বকে বেশী বেশী জানার উৎসাহ দিয়েছে। এই স্বাধীনতা ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তবমুখিনতার একটা উদাহরণ।

এই কারণেই একটা পরিপূর্ণ সভ্যতা ইসলামের আওতায় সাবলীলভাবে বর্ধিত ও বিকশিত হতে পেরেছিলো। সমসাময়িক কালের উপায়-উপকরণের প্রেক্ষাপটে সে তার সৃজনধর্মী শক্তি নিচয়ের বিকাশ ঘটিয়েছিলো। উপায়-উপকরণ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যাত্রাপথের পাথেয়। ইসলাম এগুলো লালন করে এবং এগুলো যাতে

মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখে। ইসলাম এসব গুণাবলীর দমন বা ধ্বংসের বিরোধী। আমাদের সমসাময়িক সভ্যতার জন্যে আবশ্যক বলে ডঃ ক্যারেল যেসব গুণের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অধিকারী ইসলাম।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তার বাস্তবমুখীনতার কারণেই মুসলিম স্পেনে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতির সূচনা করেছিলো। মুসলিম স্পেন হতে এই পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি ইউরোপে যায়। রোজার বেকন এবং ফ্রান্সিস বেকন ইউরোপে এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি যে ইউরোপের কৃতিত্ব নয় তা Privolt Duhring-এর মতো অনেক গ্রন্থকারই স্বীকার করেছেন।

মানব জীবনের মৌলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অধিকার ইসলাম এমন এক বিজ্ঞানের হাতে তুলে দিয়েছে যা মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ নয় এবং এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অপারগও নয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের এই চূড়ান্ত অধিকার কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহরই রয়েছে। কেননা তিনি বিশ্ব এবং তার মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সব প্রাকৃতিক আইন ও শক্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে বস্তুর ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

তিনি একমাত্র সত্তা যিনি মানুষ ও প্রকৃতির পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই কেবল তিনিই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উপযোগী বিধান রচনা করতে সক্ষম। আল্লাহ নিরংকুশভাবে সর্বব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী বিধায় তা করতে পারেন। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত না করেই মানব জীবনে প্রযোজ্য বিধান তিনিই কেবল রচনা করতে পারেন। মানুষের মন আল্লাহর সৃষ্ট এক মহান যন্ত্র যা কাজে এবং সৃজনশীলতায় ব্যবহৃত হবার জন্যে; দমিত বা বিলুপ্ত হবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির শক্তিকে বিবেকের দেয়াল দিয়ে কামনা-বাসনা, অমিতাচার, ধ্বংস ও পশ্চাদমুখীনতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। এই বুদ্ধিবৃত্তির জন্যে তিনি ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন। একে পথ-নির্দেশ করেছেন। এর স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়েছেন যাতে তা সংস্কারমুক্তভাবে কাজ করতে পারে।

এই পদ্ধতিতেই মানুষ বস্তুর প্রভু হয়ে থাকতে পারে। এই প্রাধান্য মানুষের অর্জিত হয়েছে বস্তু ও মানুষের স্রষ্টার ব্যবস্থাপনার ফলে। বিশ্বলোকে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। একমাত্র আল্লাহর কাছেই মানুষ তার মাথা নত করবে, অন্য কারো বা কিছুর কাছে নয়।

মিঃ ডালেস যে ব্যবস্থা হন্নে হয়ে তালাশ করেছেন তা আসলে ইসলাম, যদিও

তিনি কোনদিন ইসলামের সমর্থন করেননি। ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা যা যান্ত্রিকতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির বর্বরতা এবং কমিউনিজমের শাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানবতাকে মুক্তিদান করতে পারে। আর আমরা যারা ইসলামী ব্যবস্থার নিশান বরদার তারাই কেবল অবক্ষয়দুষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার খাঁচা থেকে বড়ো রকমের লাফ দিয়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে পারি।

বর্তমান শৈল্পিক সভ্যতা মানব জাতির সবচে' বেশী গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সভ্যতা একদিকে মানুষকে দিচ্ছে চমকপ্রদ বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা, অপরদিকে তা তার প্রশংসনীয় মূল্য ও গুণাবলীকে করছে বিধ্বস্ত। এমনকি এই জড় সুযোগ-সুবিধাও তার শারীরিক গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। ডঃ ক্যারেল এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন।

ইসলাম বিশ্বজগত এবং এর মাঝে মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অধিকারী এবং যুক্তিপূর্ণ বিধান হওয়ার কারণে শিল্প-কারখানাগুলো সে কখনো ধ্বংস করে দেবে না। অথবা মানুষের জীবনে এগুলোর পরিণতি রূপে যে সুবিধা এসেছে সেগুলোকেও বিলুপ্ত হতে দেবে না। অবশ্য ইসলাম মৌলিকভাবে এই সভ্যতার এবং তার শুভ দিকের ভারসাম্যহীন মূল্যায়নকে শোধরাবে। ইসলাম সভ্যতার মূল্যায়নক্ষেত্রে ভারসাম্যের পুনর্বহাল করবে। এই সভ্যতাকে তার যথার্থ আসনে বসাবে এবং কোন প্রকার অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করবে না। ইসলাম এই সভ্যতার উপর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করবে। মানুষকে সভ্যতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করবে। সে সভ্যতার যাঁতাকলের নিষ্পেষণ থেকে উদ্ধার করবে মানুষের ধারণা-শক্তি, অনুভূতি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাসমূহকে।

ইসলাম মানুষের মনে তার মূল্য ও মর্যাদার জ্ঞান দেবে এবং ডারউইন, কার্লমার্কস ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা আরোপিত হীনতা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবে। কেবল তখনই মানুষ অনুভব করবে যে সে ম্যাসিন, বস্তুগত আবিষ্কার ও সভ্যতার প্রভু।

প্রত্যয়-উদ্দীপ্ত মানুষের মন যখন প্রাধান্য অর্জনে সক্ষম হয়, তখন মানুষ তার প্রত্যয়ের গন্ডীতে স্বাধীনতা উপভোগ করার পরিবেশ খুঁজে পায়। ইচ্ছার স্বাধীনতা আজ বিঘ্নিত। তা আজ ম্যাসিন দ্বারা পরাভূত এবং ম্যাসিনের দাসে পরিণত। আত্মাহীন যান্ত্রিকতার মূল্যবোধের কঠিন বন্ধনে সে আজ বন্দী।

ইসলাম ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানবাত্মাকে সভ্যতার ঘৃণ্য বিষয়গুলো অপসারিত করতে সাহায্য করবে এবং মানবতাবাদের সাথে সমিল ও উপকারী বিষয়গুলোকে করবে সংরক্ষণ।

ন্যায়ভিত্তিক মতবাদের প্রাধান্য মানুষকে মানবতার অবমাননাকারী উৎপাদন পদ্ধতি ও ক্রিয়াকাণ্ড থেকে দেবে অব্যাহতি। মানবিক মূল্যবোধকে বলি দিয়ে কেবল অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেসব ক্ষতিকর কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলোর পরিবর্তন সাধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। এটা যদি স্বীকৃত হয় যে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, তাহলে তার মানবিক মর্যাদার সাথে সংগতি রেখে উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

ইসলামী নীতি থেকে যখন নতুন ধারণা ও নতুন মূল্যমান আবির্ভূত হবে, শৈল্পিক সভ্যতার প্রয়োজন ও পদ্ধতির সাথে যখন মানবতাবাদের দাবীগুলোর সমন্বয় সাধিত হবে, তখনই কেবল "মানব বিজ্ঞান" অর্থপূর্ণ হবে এবং এই বিজ্ঞান ইসলামের সাধারণ সীমারেখার মধ্যে সম্পৃক্ত হবে। আর সেই মুহূর্তেই মিঃ ডালেসের মতো লোকেরা যে বিশেষ ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছেন– যার উদাহরণ তাঁরা গীর্জা ও পাদরীদের মাঝেও পাননি– তার জবাব পাবেন।

এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক যে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী এবং বিশ্ব প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। দুটোর মধ্যেই দেখা যায় গতি, উদ্ভাবন এবং বর্ধন। এই সাধারণ গুণগুলো আমাদের সভ্যতার অনেক কিছুর সাথেই মিলে যাবে। মানব-অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এমন কোন কিছুর সাথেই এই সভ্যতার সংঘর্ষ বাধবে না। যেটার সাথে সংঘর্ষ বাধবে, সেটা তো তিরোহিত হবেই। জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার কার্যকারিতার কারণেই তা সংঘটিত হবে।

ইসলামই হচ্ছে পাশ্চাত্যবাসীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত অথচ পাশ্চাত্যবাসীদের আকাঙ্ক্ষিত 'ত্রাণকর্তা'।

আগামী দিনের জীবন বিধান

বস্তুবাদী সভ্যতার চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান মানবতার মুক্তিসনদ হিসেবে যখন ইসলাম স্বীকৃত, বস্তুগত উন্নতি ও আত্মিক উন্নতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে যখন কেবল ইসলামই সক্ষম এবং অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন অথচ বাস্তবধর্মী একটা জীবন পদ্ধতি দেবার যোগ্যতা যখন শুধু ইসলামেরই আছে, তখন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ওপর যারা অত্যাচার-নিপীড়ন চালায় তারা মানবতার বিরুদ্ধে কতো বড়ো জঘন্য অপরাধ করছে তা সহজেই অনুমেয়। এসব অপরাধীদের মধ্যে ডালেস সাহেবও একজন। তিনি মানবজাতিকে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। একটা আদর্শ ও কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি ইসলামী ব্যবস্থার গুণাবলী ও বৈশিষ্টগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং ইসলামের শক্তিমত্তার প্রতিরোধের প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। ত্রাণ-প্রার্থী মানুষগুলোর মনকে ইসলামের প্রতি বৈরীরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা যুক্তি প্রচার করে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ প্রচার যুদ্ধ পরিচালনা সত্বেও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইসলামই হচ্ছে আগামী দিনের জীবন বিধান। কোন মিথ্যা প্রচারণাই আমাদের এই অবিচল আস্থা বিনষ্ট করতে পারবে না।

অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইমলামকে আগে আজকের চেয়েও বেশী তীব্র ও নৃশংস আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। ইসলাম নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই তার অনুসারীদেরকে এবং তাদের দেশগুলোকে সংরক্ষণ করে এসেছে। ইসলাম মুসলিম দেশগুলোকে তাতার ও খৃস্টান ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। যদি তাতার ও খৃস্টান ক্রুসেডারগণ লড়াইতে বিজয়ী হতে পারতো তাহলে খৃস্টানদের হাতে স্পেনের এবং ইহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের মতো কোন জাতি বাঁচতে পারতো না। অতীতের স্পেন এবং আজকের ফিলিস্তিনের ঘটনা প্রমাণ করে যে কোন এলাকা থেকে ইসলাম বিতাড়িত হলে, সাথে সাথে সেই এলাকার ভাষা এবং জাতীয় পরিচিতিও বিদায় গ্রহণ করে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ইসলামী দেশগুলো থেকে তাতারদেরকে তাড়িয়ে ছিলো মামলুকগণ। অথচ এই মামলুকেরা আরব বংশীয় ছিলো না। তারা ছিলো তাতারদেরই সমগোত্রীয়। যেহেতু তারা মুসলিম ছিলো সেহেতু ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্যে স্ব-গোত্রীয় তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইমাম তাইমিয়ার অনুপ্রেরণা তাদেরকে ইসলামের জন্যে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

সালাহউদ্দীন ইসলামী এলাকার প্রতিরক্ষার মাধ্যমে আরব ও আরবদের ভাষাকেও রক্ষা করেছিলেন। তিনি নিজে আরব ছিলেন না। ছিলেন একজন কুর্দ। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা পেলো। রক্ষা পেলো আরবদের ভাষা ও সংস্কৃতিও। আল জাহের বাইবার্স, আল মুজাফফর কুৎজ এবং আল মালিক আন নাসীর যেভাবে ইসলামী ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, গাজী সালাহউদ্দীনও সেভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

আলজিরিয়া একশ' পঞ্চাশ বছর ফরাসীদের অধীনে থেকে স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি হারাতে বসেছিলো। ফরাসী সরকার আলজিরিয়াতে আরবী ভাষাকে বিদেশী ভাষা আখ্যা দিয়ে তার শিক্ষাদান বন্ধ করে দিয়েছিলো। সেদিন আলজিরিয়ার বুকে ইসলামই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মুসলিমগণ ফরাসী বাহিনীকে নতুন ক্রুসেডার বাহিনী মনে করলো এবং জিহাদে নেমে পড়লো। ইসলামী চেতনাই আলজিরিয়াবাসীর স্বাধীনতার অনুভূতি বাঁচিয়ে রেখেছিলো। পরবর্তীকালে আবদুল হামিদ বিন বাদিস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন এই চেতনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের এটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত সত্য। অনেকেই এই সত্যকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরাসী ক্রুসেডারদের কাছে এই সত্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আলজিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামী চেতনাই ফরাসীদের বড়ো বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই ফরাসীরা তাদের যুদ্ধ আরব বা আলজিরীয়দের বিরুদ্ধে ঘোষণা না করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলো।

ইসলামী চেতনা আল-মাহদীকে নীল উপত্যকায় (মিসর) ব্রিটিশ দখলের বিরুদ্ধে জিহাদে নামিয়েছিলো। সুদানের মুক্তির জন্যে তাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামিয়েছিলো এই ইসলাম। আল-মাহদীর ঘোষণাবলী এবং ইসমান

দাকনার বাণীগুলো– যেগুলো তাঁরা কিচেনার, ক্রোমার ও তাওফিকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন– ইসলামী চেতনার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

সিরেনাইকা (Cyrenaica) ও ত্রিপোলিটানিয়াতে ইতালীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো ইসলাম। সানৌসীদের সব ফাঁড়ি ও মসজিদ থেকে প্রতিরোধ সূচিত হলো এবং উমার আল-মুখতারের জিহাদ শুরু হলো।

মরক্কোর প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন এই ইসলামী চেতনা থেকেই উৎসারিত। ফরাসী শাসকগণ কর্তৃক প্রণীত ১৯৩১ খৃস্টাব্দের "বারবার আইন" বারবার সম্প্রদায়কে ইসলামী শরীয়াহর বাইরে নিয়ে আসতে চাইলো। অধার্মিকতা ও খোদাদ্রোহিতার দিকে বারবারদেরকে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত হলো। পরিণামে ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। জাগ্রত মুসলিম জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

যুগ যুগ ধরে ইসলামের এই লড়াই চলেছে। কিন্তু মারাত্মক মারণাস্ত্রের অধিকারী না হয়েই সে এই লড়াই করে এসেছে। ইসলামের আসল শক্তি এর অনাবিলতা, স্বচ্ছতা ও সার্বজনীনতার মাঝে লুক্কায়িত। এই শক্তি মানব-পূজার অস্বীকৃতি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত থেকে উৎসারিত। এটা এমন এক শক্তি যা মুসলিম হৃদয়ে উৎপীড়ন-নিপীড়নের মুখেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মানসিকতা সৃষ্টি করে। ইসলাম যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অন্তর ও বিবেকে বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক ও আপাতঃ পরাজয় ঘটা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির আত্মিক পরাজয় ঘটে না।

এই গুণপনা আছে বলেই ইসলামের দুশমনেরা এর বিরুদ্ধে অবৈধ যুদ্ধ পরিচালনা করে চলছে। ইসলাম তাদের পথের কাঁটা। অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার, যুলুম-নির্যাতন পরিচালনা এবং সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার পথে ইসলামই হচ্ছে বড়ো বাধা। এই কারণেই এর বিরুদ্ধে এতো জঘন্য প্রচারণা। ইসলামের বিকল্প হিসেবে তারা অন্যান্য মূল্যবোধ মেনে নিতে প্রস্তুত। এরা ইসলামের শক্তিতে ভেজাল মেশাবার চেষ্টাও করেছে। এরা ইসলামকে দুর্বল করতে চায় যাতে আন্ত র্জাতিক ইহুদীবাদ, আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার বাহিনী এবং সাম্রাজ্যবাদ এর ওপর বিজয়ী হতে পারে।

ইসলামের অজেয় মৌলিক গুণাবলী ইসলামের শত্রুদের হিংসার কারণ। ইসলামী দেশ ও এগুলোর সম্পদ-শক্তি যারা লুণ্ঠন করতে চায় তাদের কাছে ইসলামের এই গুণটি অসহনীয়। একদিকে যুদ্ধ পরিচালনা, অপরদিকে মিথ্যা প্রচারণার

এটাই আসল কারণ। বিরোধিতার এটাই মূল।

এতদসত্ত্বেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতকাল এই ধর্মের জন্যে নির্ধারিত।

"এই ধর্মীয় ব্যবস্থার সুউচ্চ ও মহান পরিকল্পনা এবং এমন একটা ব্যবস্থার জন্যে মানবজাতির স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে ইসলামই হচ্ছে আগামী সভ্যতার জীবন বিধান। এক নজীরবিহীন ভূমিকা পালনের জন্যে সে আহুত হবে। কেননা ইসলামের শত্রুরা স্বীকার করুক আর না-ই করুক এই ভূমিকা অপর কোন ধর্ম বা মতবাদ দ্বারা পালিত হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি গোটা মানবজাতি আর অধিককাল ধরে এই ধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আত্মরক্ষার মহা তাকিদেই মানুষ একে গ্রহণ করবে।"

এই প্রসঙ্গে আসুন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা পরখ করি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রা) গোপনে মদীনায় হিজরত করছিলেন। সুরাকা ইবনে মালিক তাঁদের অনুসরণ করছিলো। সুরাকা বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ছিলো। কিন্তু সে দমলো না। কুরাইশগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে বড়ো রকমের ইনাম দেবে বলে ঘোষণা করেছে। এই ইনামের লোভে সুরাকা বার বার হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলো। কিন্তু সে মুহাম্মাদকে (সা) ধরে ফেলার মতো নৈকট্যে পৌঁছতে পারছিলো না। সে তখন পিছু ফিরতে মনস্থ করলো। এই সময় বিশ্বনবী (সা) বললেন, "ওহে সুরাকা, তুমি কি শাহের ব্রেসলেটের মালিক হওয়া পছন্দ করবে?" অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) সুরাকাকে পারস্যের বাদশাহর ব্রেসলেট দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। আল্লাহ-ই জানেন একজন মাত্র সঙ্গী সাথে নিয়ে পলায়নরত ব্যক্তিটির এই প্রতিশ্রুতি শুনে সুরাকা কি ভেবেছিলো।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) জানতেন তিনি সত্য পথে আছেন এবং অবিশ্বাসীরা আছে মিথ্যে পথে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ন্যায় ও সত্য অন্যায় ও অসত্যকে পরাভূত করবেই। অন্যায় ও অসত্য দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। অসত্য সেদিন পানি ও সারবিহীন একটা গাছের মতো নেতিয়ে পড়ছিলো এবং অচিরেই এর মূল পচে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল সত্যকে দেখছিলেন একটা তাজা বীজের মতো যা অঙ্কুরিত, বৃক্ষে পরিণত এবং

ফুলে-ফলে শোভিত হবার সম্ভাবনা ছিলো। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না।

আজ আমরা তেমনি একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি। আমাদের চারদিকে প্রাক ইসলাম যুগের জাহিলিয়াত। এর অবধারিত পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হবার অবকাশ নেই। আমাদের চারদিকে বিরাজমান পরিবেশের অনিবার্য পরিণতিরূপেই তা ঘটবে।

আজকের মানুষের জন্যে ইসলামের প্রয়োজন রাসূলুল্লাহর (সা) যুগের মানুষের জীবনে ইসলামের প্রয়োজনের মতোই তীব্র। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে এমনি এক পরিস্থিতিতে অতীতে যা ঘটেছে, আজকে বা আগামীতেও তাই ঘটবে। বস্তুবাদী সভ্যতার প্রসার ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চলা সত্বেও আমাদের মনে যেন সংশয়বাদ সামান্যতম রেখাপাত না করতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য অন্যায় ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, এটা সত্য। কিন্তু সত্যের শক্তি ইসলামের পক্ষে। সব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কালজয়ী হবার সামর্থ্য আছে ইসলামের।

আমরা একা নই। প্রকৃতি আমাদের পক্ষে। অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি মহাশক্তিধর। এই শক্তি সভ্যতার অপরাপর শক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন– সংঘর্ষকাল যত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হোক না কেন– প্রকৃতি বিজয় লাভ করে।

এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রাম– মানব রচিত সব মতবাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি কায়েমের তিক্ত ও কষ্টকর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের জন্যে আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। নিজেদেরকে সত্য ধর্মের দাবী অনুযায়ী উন্নত করে নিতে হবে। আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ তাঁর সুস্পষ্ট পরিচিতি না জানতে পেলে আমরা পরিপূর্ণভাবে ও সচেতনভাবে তাকে বিশ্বাস করতে পারবো না। আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি গভীর প্রত্যয় স্থাপন করে সমুন্নত হতে হবে।

পারিপার্শ্বিকতাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সমসাময়িক কালের উপায়-উপকরণ ও কর্ম-পদ্ধতির অবগতি থাকতে হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন যারা সময়ের প্রবাহকে উপলব্ধি করে এবং সিরাতুল মুস্তাকীমে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে।

আজকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা এগুলোর

প্রয়োজনীয় দিকগুলোকে গ্রহণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করবো। নির্ভুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে আমরা এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করবো।

মানব অস্তিত্বের উৎস আমাদেরকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে সেসব জিনিষ যেগুলো তাকে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে সক্ষম। এই আলোকে আমরা বর্তমান সভ্যতার সবকিছু বিশ্লেষণ করে এগুলো সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভংগি স্থির করবো।

ইসলামকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নিঃসন্দেহে দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই সংগ্রাম এক পবিত্র ও মহান সংগ্রাম। এই পথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

"আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।" –সূরা ইউসূফ